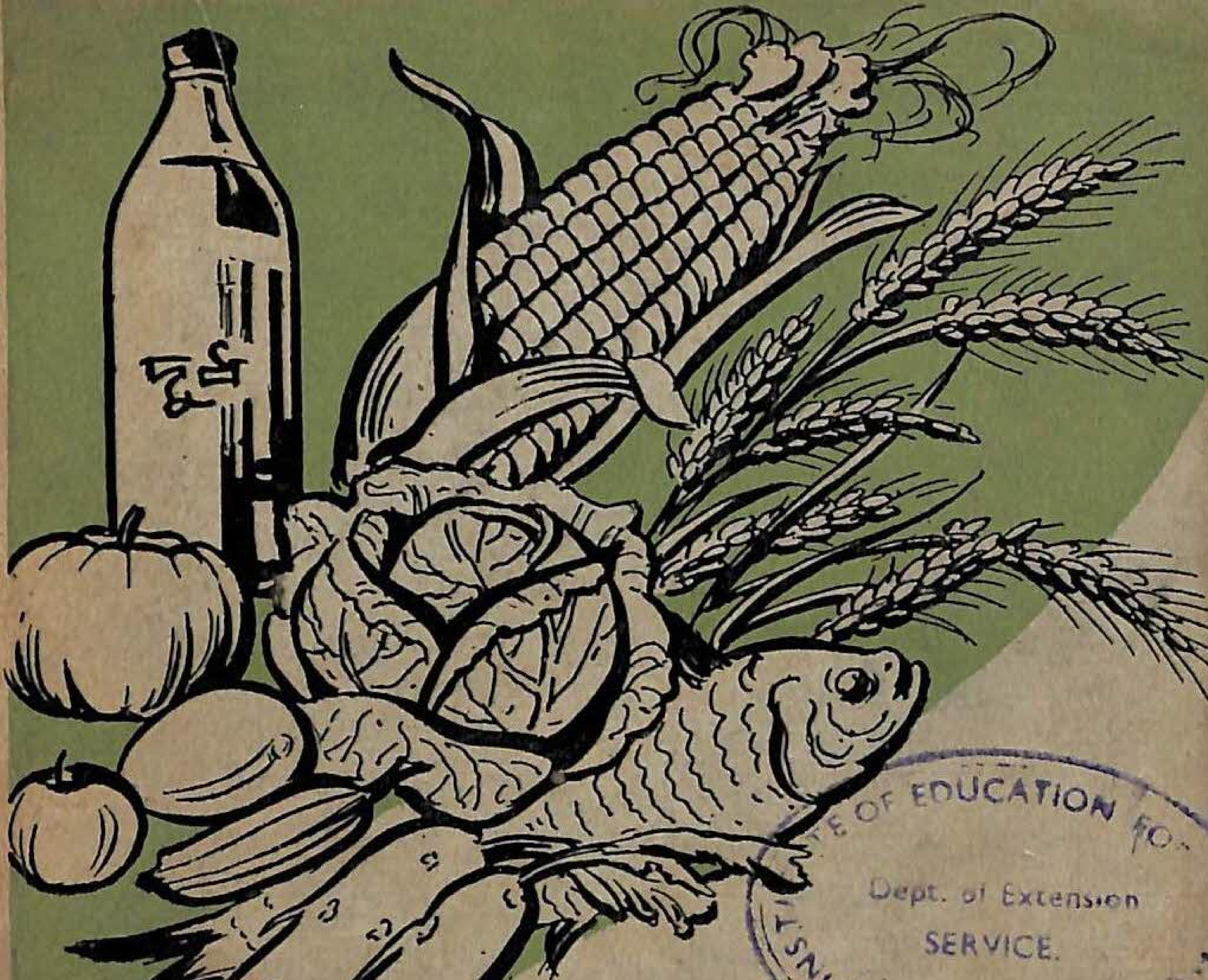


আমাদের খাদ্য

আমাদের খাদ্য

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম, এস-সি, ডি.ফিল
অধ্যক্ষ—সার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ল্যাবরেটরি
পরীক্ষক—জার্মান ভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
'খাদ্য-বিজ্ঞান', 'মাটির মায়া', 'ভারতের রাসায়নিক শিল্প';
'জার্মান প্রাইমার ফর সায়েন্স ষ্টুডেন্টস',
'স্কোপ অব কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রি ইন্ ইণ্ডিয়া', ও
'ডেভেলপমেণ্ট অব কোলটার কালার
ইনডাষ্ট্রি' গ্রন্থের প্রণেতা

মূল্য ১৸৹ আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ

৭৮৷৬, লায়েল স্ট্রীট, ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৫৬

মুদ্রাকর

শ্রীপরমানন্দ সিংহরায়

শ্রীকালী প্রেস

৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,

কলিকাতা

শ্রদ্ধেয়

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়

করকমলেষু

ভূমিকা

বর্তমান খাদ্য-সমস্যার দিনে খাদ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই সঙ্কোচ বোধ হয়। যেখানে অধিকাংশ লোকই অতি কষ্টে উদর-পূর্তি করিতেছে, সেখানে খাদ্যের ভালমন্দ ভাবিবার অবসর কোথায়! তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাচুর্যের সময় অপেক্ষা অনটনের মধ্যেই খাদ্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিক প্রয়োজন। সামান্য আয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য কিরূপে সংগ্রহ করা যায়, 'আমাদের খাদ্য' পুস্তকে লেখক তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

আমাদের শরীর রক্ষার্থে সাধারণ শাকসব্জীরও যে অসাধারণ উপকারিতা আছে, তাহা এই পুস্তকে সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। আজকাল সকল দেশেই লোকে খাদ্যের শক্তিপ্রদ উপাদান—কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ অপেক্ষা রক্ষী খাদ্য (protective food)—ভিটামিন, প্রোটিন ও লবণ পদার্থের উপর সমধিক মনোযোগ দিতেছেন। এই পুস্তকে এ বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের সাধারণ খাদ্য-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহিত উহার দোষগুণ নির্ণয়ে লেখক নূতন আলোক-সম্পাত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত 'খাদ্যবিজ্ঞান' গ্রন্থখানি শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের খাদ্য-বিষয়ক জ্ঞান যাহাতে স্কুলের বালক-বালিকা ও সাধারণ শিক্ষিত সমাজের উপকারে আসিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সহজ ও সরল ভাষায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে।

আজকাল পাশ্চাত্ত্যের অনেক স্থানেই খাদ্য-বিষয়ক শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্যের উপর জীবনের সকল সাফল্য নির্ভর করে; আর স্বাস্থ্যরক্ষায় খাদ্যের উপযোগিতা সর্বাগ্রগণ্য। সুতরাং মাতৃভাষায় লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা খাদ্যের মূল তথ্যগুলি জানিয়া সেগুলি তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপালন করিলে তাহারা সহজেই ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া জাতির স্বাস্থ্যসম্পদ বর্ধন করিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অর্থসাচ্ছল্য থাকিলেও অনেক সময় অজ্ঞতা ও অবহেলাবশতঃ উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে ব্যাঘাত ঘটে, ফলে পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যহানিজনিত নানারূপ অশান্তি দেখা দেয়। খাদ্যের মূল তথ্যগুলি জানা থাকিলে রোগীর পথ্য নির্ণয়েরও সুবিধা হয়। আলোচ্য পুস্তকখানির বিভিন্ন অধ্যায়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির সহজবোধ্য বিবরণ সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার বহুল প্রচারে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

কলিকাতা
৩০।১১।৪২

বিমল [signature]

গ্রন্থকারের নিবেদন

অতি অল্পদিনের মধ্যেই 'আমাদের খাদ্য' নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় ইহার 'পাক' খারাপ হয় নাই বুঝা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের খাদ্য বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি বিবৃদ্ধ অনুরাগ সূচিত হইল।

ক্রমবর্ধমান দুর্মূল্যের দিনে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে খাদ্য-নির্বাচন সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। এই পুস্তকে অতি সহজ সরল ভাষায় সেই গুরুতর সমস্যা সমাধানের পন্থার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের নাম 'আমাদের খাদ্য' না রাখিয়া 'গরীবের খাদ্য' রাখিলেই অধিকতর সার্থক হইত বলিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন।

প্রথম সংস্করণের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরসন করিয়া নূতন আবিষ্কৃত তথ্যাদি এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইল। আমার সাম্প্রতিক ইউরোপ ভ্রমণে খাদ্যবিষয়ে যে সকল তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি।

নূতন নূতন তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ, বর্ধিত কলেবর, জনপ্রিয় এই পুস্তকের মূল্য বাড়ানো হইল। সহৃদয় পাঠকবর্গ, বিশেষ করিয়া জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী শিক্ষক সম্প্রদায় পূর্ব সংস্করণের মতই ইহা সাদরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ল্যাবরেটরি
১৬৪, মাণিকতলা মেন রোড
কলিকাতা—১১
শ্রাবণ—১৩৫৬ সাল।

বিনীত
গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের নিবেদন

[প্রথম সংস্করণ]

পৃথিবীর ২৩০ কোটি লোকের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ লোক কৃষিকার্য, বনবিভাগ ও মৎস্য শিকার লইয়া ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও খাদ্যের উৎকর্ষের কথা দূরে থাকুক, এখনও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য হইতেও অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, যাহারা খাদ্য উৎপাদন করে, তাহাদের খাদ্যাভাবই সবচেয়ে বেশী। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ-পরম্পরার মধ্যে দুইটি মুখ্য কারণ অনুমান করা যায়—জনবহুল এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ অংশে এখনও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি ও গবাদি পশুপালন এবং হাঁস মুরগী প্রভৃতি পাখী পালনের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া এবং মানুষের মধ্যে 'সকলের সাথে অন্নপান ভাগ ক'রে খাওয়ার' মত উদার মনোবৃত্তির নিদারুণ অভাব। সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত কারণবশতই আজ ভারতমাতা "দেশে বিদেশে 'মাগিতেছে' অন্ন" অবস্থায় উপনীত। আমাদের জাতীয় অজ্ঞতা ও আলস্যও ইহার জন্য কম দায়ী নয়। বসতবাটী-সংলগ্ন জমিতে অন্ততঃ নিজেদের আবশ্যকমত শাকসব্জী অনেকেই ফলাইতে পারেন ; কিন্তু সেদিকে কাহারও বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায় না। আমাদের জাতীয় শিক্ষারও অনেক সংস্কার আবশ্যক। ইউরোপ, আমেরিকার স্কুলে ছাত্রদের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদানের ফলে তাহাদের

ভবিষ্যৎ জীবনে খাদ্য নির্বাচনের সুবিধা হইতেছে। স্বাস্থ্যবান্, শক্তিদৃপ্ত জনগণই যে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহা ঐসব দেশের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উপলব্ধি করেন, আমাদের দেশে তাহারও নৈরাশ্যজনক অভাব বিদ্যমান। সুতরাং স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করা বা গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্যের তত্ত্বাবধান করিবার মত মনোবৃত্তি আমাদের দেশে এখনও বিকাশলাভ করে নাই। আশা করি, এই পুস্তকখানি অন্ততঃ আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিবে।

১৯৩৬ সালে প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে তাঁহার পুণ্যনাম যুক্ত করিয়া 'খাদ্যবিজ্ঞান' প্রকাশ করি। প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তকখানি বাংলার সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'খাদ্য-বিজ্ঞান' পড়িয়া অতিশয় প্রীত হন এবং আমাকে নিম্নলিখিত আশীর্বাণী প্রেরণ করেন—"বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরীক্ষায় স্থির হয়েছে, বাঙালীর খাদ্য ভারতবাসী অন্যান্য জাতির তুলনায় অতিশয় হীন; অবিলম্বে এর প্রতিকার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। 'খাদ্যবিজ্ঞান' বইখানি এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস করি।" শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহোদয়ও 'খাদ্যবিজ্ঞান' পড়িয়া আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী সংস্করণে সন্নিবেশের জন্য আমাকে কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশ দেন। এই পুস্তকে সেগুলি সন্নিবেশিত হইল। বাংলার শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুও খাদ্যবিজ্ঞানের তথ্যসম্ভারে চমৎকৃত হইয়া স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপযোগী

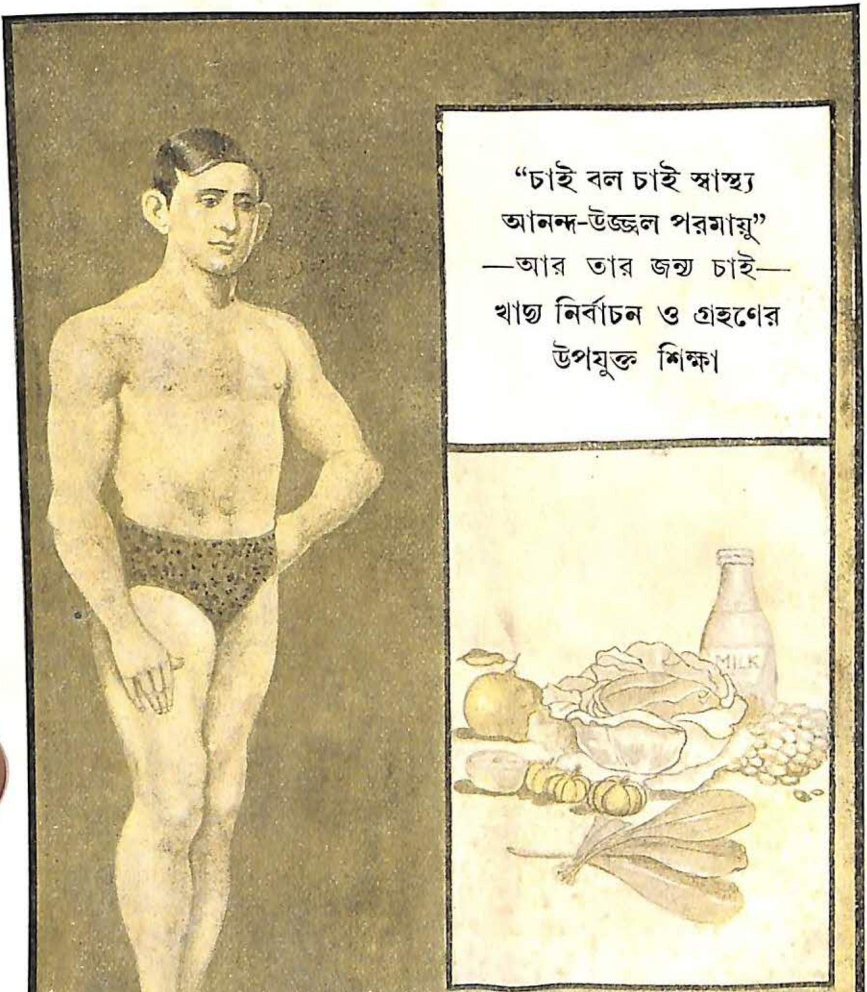
একখানি সহজবোধ্য পুস্তক রচনার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। তাঁহাদের উৎসাহে ১৯৪১ সালে আমি এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি এবং সৌভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় মহোদয়ের ভূমিকা পাই। কয়েক বৎসর অপেক্ষা করার পর এবার সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। অবশ্য প্রকাশের পূর্বে পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া নূতন আবিষ্কৃত তথ্যাদিও যথাসম্ভব সন্নিবেশ করা হইয়াছে। প্রকাশক এবং শুভানুধ্যায়ী সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত হইল, তাহার আংশিক সম্পূর্তি সাধিত হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ল্যাবরেটরি
১৬৪, মাণিকতলা মেন রোড
কলিকাতা।
জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৪ সাল।

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচী


"চাই বল চাই স্বাস্থ্য
আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু"
—আর তার জন্য চাই—
খাদ্য নির্বাচন ও গ্রহণের
উপযুক্ত শিক্ষা
MILK

আমাদের খাদ্য

খাদ্যের গোড়ার কথা

খাদ্যের কথা দেখিয়া তোমরা হয়ত ভাবিবে, খাদ্যের আবার পরিচয়ের প্রয়োজন কি? খাদ্যের সঙ্গে ত আমরা জন্ম হইতেই পরিচিত। দুধ, রুটি, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ঘি, তেল, পেয়ারা, কলা, আম প্রভৃতি খাদ্য, এ কথা কে না জানে? কথাটি ঠিক, কিন্তু তথাপি জানা দরকার—কোন্ খাদ্য কেন খাই, কোন্ খাদ্য কোন্ বয়সে বেশী খাওয়া দরকার ইত্যাদি।

কেন খাই? এ কথার উত্তরে তোমরা বলিবে ক্ষুধা পায় বলিয়াই খাই। একথাও ঠিক, কিন্তু কেন ক্ষুধা পায় তাহা বোধ করি তোমরা জান না। এই সব বিষয় বুঝাইবার জন্যই খাদ্য-পরিচয়ের প্রয়োজন।

খাদ্যের দুইটি প্রধান প্রয়োজনীয়তা আছে। তোমরা দৌড়া-দৌড়ি বা খেলাধূলা করিবার পর বেশী ক্ষুধার্ত বোধ কর, অর্থাৎ তখন তোমাদের খাদ্যের উপর টান পড়ে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, পরিশ্রমের জন্য খাদ্য দরকার। তারপর তোমরা শিশু অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বড় হইতেছ, ইহা কিসের ফলে হইতেছে তাহা নিশ্চয়ই জান। এই বড় হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়াও খাদ্যের সাহায্যেই হইতেছে। তাহা হইলে এখন তোমরা

দেখিতেছ যে, কাজ করিবার জন্য এবং শরীরের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তোমরা হয়ত বলিবে, শিশুরা কোন্ কাজটি করে? শিশুদের পক্ষে হাত-পা ছোঁড়া, হাসা, কাঁদা, হামাগুড়ি দেওয়া প্রভৃতিই শ্রমের কাজ। এখন তোমরা বুঝিতে পারিলে খাদ্য মোটামুটি দুইটি প্রধান কাজ করে ঃ—

(১) কোনও কোনও খাদ্য কেবলমাত্র শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে অর্থাৎ সেগুলি শক্তিপ্রদ খাদ্য।

(২) আবার কতকগুলি খাদ্য শুধু শরীর গঠনের কাজে লাগে অর্থাৎ সেগুলি গঠনমূলক খাদ্য।

. তোমরা জান যে, শিশুরা শুধু দুধ খাইয়াই হাসা, কাঁদা হাত-পা ছোঁড়ার কাজ করে, আবার বাড়েও; সুতরাং দুধে খাদ্যের দুই প্রকার গুণই আছে বুঝিতে হইবে। আমাদের সাধারণ খাদ্যের প্রায় প্রত্যেকটিতেই উক্ত দুই রকমের গুণ থাকে, তবে কোনও খাদ্যে শক্তিপ্রদ অংশ বেশী, কোনও খাদ্যে বা গঠনমূলক অংশ বেশী থাকে। অবশ্য আমরা এমন জিনিসও খাইয়া থাকি যাহার মধ্যে খাদ্যের কেবল একটি মাত্র গুণ থাকে। উদাহরণস্বরূপ—সরিষা, তিল বা বাদাম তেলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে শুধু শক্তিপ্রদ উপাদানই বিদ্যমান।

খাদ্যের গুণাগুণ জানিলে কোন্ খাদ্য কোন্ বয়সে বেশী দরকার তাহা বুঝিবার সুবিধা হয়। ভাত-ডাল, রুটি-মাখন, মাছ-মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, আম, আনারস, আপেল, আতা, পেয়ারা, শশা, নারিকেল, কুল, কমলালেবু প্রভৃতি যত রকমের

জিনিসই আমরা খাই না কেন, সেগুলি ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ—

(১) কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার ও শর্করা, (২) ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ, (৩) প্রোটিন বা আমিষপদার্থ, (৪) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, (৫) লবণপদার্থ ও (৬) জল।

অধিকাংশ খাবার জিনিসেই উল্লিখিত উপাদানগুলির একাধিক পদার্থ থাকে। আমরা যে ভাত খাই, উহার প্রধান উপাদান শ্বেতসার হইলেও উহাতে অল্পমাত্রায় আমিষ ও লবণ পদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া ভাতের মধ্যে জলের পরিমাণও যথেষ্ট।

উপরে খাদ্যের যে উপাদানগুলির উল্লেখ করা হইল, সেগুলি কোন্ কোন্ জিনিসের মধ্যে বেশী থাকে এবং শরীরের কি কি কাজে লাগে, তাহার মোটামুটি পরিচয় এখন দিতেছি। পরে প্রত্যেকটি উপাদান সম্বন্ধে বেশী করিয়া বলিব।

(১) কার্বোহাইড্রেট কথাটির দ্বারা শ্বেতসার ও শর্করা উভয় শ্রেণীর পদার্থকেই বুঝায়। চাউল, আটা, ময়দা, সাগু, বার্লি, মানকচু, কাঁচাকলা, গোলআলু প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান দ্রব্য। চিনি, গুড়, মধু প্রভৃতি শর্করা-শ্রেণীভুক্ত। কার্বোহাইড্রেটের একমাত্র কাজ শরীরের শক্তি সরবরাহ করা।

(২) ঘি, মাখন, সরিষা, বাদাম, তিল ও নারিকেল তেল, চর্বি প্রভৃতি স্নেহপদার্থ। ইহাদের প্রধান কাজ শরীরের শক্তি সরবরাহ করা। মোটামুটি জানিয়া রাখিবে যে, ইঞ্জিনের পক্ষে তেল বা কয়লা যেরূপ দরকারী, শরীরের পক্ষে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থগুলি সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

(৩) প্রোটিন বা আমিষপদার্থের প্রধান কাজ গঠনমূলক। শরীরের রক্তমাংস প্রভৃতির গঠনে আমিষপদার্থের প্রয়োজন। কথায় বলে 'মাংসে মাংস-বৃদ্ধি'। গঠনমূলক কার্যের জন্য যতটা প্রোটিন খাওয়া দরকার, তাহার চেয়ে বেশী খাইলে উদ্‌বৃত্ত অংশ কার্বোহাইড্রেটের মতই কাজ করে—অর্থাৎ শক্তির যোগান দেয়।

(৪) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ অনেকগুলি আছে। ইহারা অন্য খাদ্যসামগ্রীর সহিত অতি অল্প মাত্রায় থাকে এবং অতি অল্প পরিমাণেই শরীরের পক্ষে প্রয়োজন।

(৫) করকচ, সৈন্ধব প্রভৃতি লবণ ভিন্ন আরও অনেক প্রকার লবণপদার্থ শরীরের পক্ষে দরকার। তবে সেগুলি অপরাপর খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গেই পাওয়া যায় বলিয়া এগুলি পৃথক খাইবার দরকার করে না। গাছের পাতা পোড়াইলে সাদা ছাই পড়িয়া থাকে দেখিয়াছ। এই সাদা জিনিসগুলি পাতার ভিতরের লবণ। ফল, তরিতরকারি ও দুধে লবণপদার্থ বেশী। লবণপদার্থের প্রধান কাজ শরীরের কাঠামো—হাড়, দাঁত প্রভৃতি গঠন করা এবং রক্ত-গঠনে সাহায্য করা।

(৬) শুধু জল ছাড়া প্রত্যহ যে সকল খাদ্যসামগ্রী খাওয়া হয়, সেগুলির সঙ্গেও অনেক পরিমাণে জল উদরস্থ হয়। ভুক্ত পদার্থের পরিপাকের জন্য জলের দরকার। পরিপাকের পর পদার্থগুলি শরীরের বিভিন্ন শিরা-উপশিরার ভিতরেও জলের সাহায্যে সঞ্চালিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। মানুষের শরীরে অর্ধেকের উপরে জল। সম্পূর্ণরূপে জল খাওয়া বন্ধ

করিলে মানুষ অতি শীঘ্র মরিয়া যায়, এজন্য জলের অপর নাম জীবন।

খাদ্য-বিষয়েও যিনি যত বেশী জানিবেন, তিনি তত ভাল ভাবে খাদ্য বাছিয়া খাইয়া নীরোগ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্ত্যদেশে পূর্বে লোকে গড়ে ৪০।৫০ বৎসর বাঁচিত। এখন খাদ্য-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করায় এবং উপযুক্ত খাদ্য খাওয়ায় ঐ সব দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল হইয়াছে ৬০।৭০ বৎসর। আমি ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ৬৫।৭০ বৎসর বয়সের লোকদেরও যুবকের মত পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি।

জানার উপরে কতটা নির্ভর করে, তাহা নীচের উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারিবে।

অশোক ও বীরেন একই ক্লাসে পড়ে। প্রত্যেকেই বাড়ি হইতে আসিবার সময় তিন আনা করিয়া পয়সা টিফিনের জন্য আনিয়াছে। অশোক টিফিনের সময় এক আনার ডালমুট ও দুই আনার জিলিপি কিনিয়া খাইল। বীরেন ছয় পয়সার একটি সিদ্ধ ডিম, দুই পয়সার শশা ও চার পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইল। তোমরা বলিবে, অশোকের টিফিনই ভাল হইয়াছে। কিন্তু খাদ্য-বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে তোমরা বলিতে—বীরেনের টিফিনই ঠিক হইয়াছে।

অনেকে বলিবে যে, ডিম, দুধ, মাছ-মাংস, আঙুর, বেদানা ভাল খাদ্য তাহা কে না জানে? কিন্তু সে খাদ্য জোগাড় করিবার মত আমাদের পয়সা কোথায়? সুতরাং খাদ্য সম্বন্ধে জানিয়া লাভ

কি ?—কিন্তু উপরে অশোক ও বীরেনের কথা হইতে তোমরা দেখিতে পাইলে, হাতে সমান পরিমাণ পয়সা থাকিলেও শুধু জ্ঞানের অভাবে ভাল খাদ্য বাছাই করিয়া উঠা যায় না। খাদ্য-বিষয়ে তোমাদের যতই জ্ঞান বাড়িবে, ততই বেশভূষার চেয়ে খাদ্যের প্রতিই যে বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত তাহাও তোমরা বুঝিতে পারিবে। সর্বদাই মনে রাখিবে—

ঘরেতে নাইক খাবার
বাহিরে জামার বাহার।

এই অবস্থাই সবচেয়ে মারাত্মক।

আর একটি কথা, খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে তোমরা আলু খাইবে না, শাক খাইবে না এইরূপ আবদার করিতে পারিবেনা ; ফলে সুস্থ শরীরে মন দিয়া খাটিয়া লেখাপড়া শিখিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার বা বড় হইবার আকাঙ্ক্ষাও স্বতই তোমাদের মনে জাগিবে।

তোমরা খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে আরও জানিতে চাও নিশ্চয়ই। পরের অধ্যায়গুলিতে তাহা জানিতে পারিবে।

কার্বোহাইড্রেট

তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, চাল, আটা, গুড়, চিনি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট-শ্রেণীভুক্ত। এগুলি কোথা হইতে আসে তাহা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এগুলি সবই আমরা উদ্ভিদ্ হইতে পাই। ধান ও গমের বীজ হইতে চাল ও আটা তৈরি

হয়। এগুলি গাছেরা শিশু-চারার খাদ্যরূপে বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখে, আর আমরা সেগুলি খাইয়া প্রাণধারণ করি। আমরা যে আলু খাই, উহাও ভবিষ্যৎ আলুচারার জন্য সঞ্চিত খাদ্য। আখ, তাল, নারিকেল ও খেজুরগাছের রস হইতে আমরা চিনি পাইয়া থাকি। গুড়ের মধ্যে অনেকটা চিনি থাকে। রাসায়নিক উপায়ে গুড় হইতে সাদা চিনি তৈরি করা যায়। জার্মানি প্রভৃতি দেশে বীট থেকে চিনি তৈরি হইয়া থাকে। বীটের চিনি এবং আখের চিনির মধ্যে কোনও তফাৎ নাই। বড় হইলে এ সব জানিবে। পাকা আম, কাঁঠাল, আনারস, আপেল, খেজুর, কলা, কমলালেবু প্রভৃতি ফলেও অনেক রকমের চিনি থাকে।

শ্বেতসার জলে গলে না। কিন্তু চিনি মধু প্রভৃতি জলে গলিয়া যায়। তোমরা মিছরি বা চিনির সরবৎ দেখিয়াছ। ইহা ঠিক জল বলিয়া মনে হয়। মুখে না দিলে টের পাওয়া যায় না। ভাত রুটি প্রভৃতির এরূপ সরবৎ করা যায় না। অথচ শরীরের কাজে লাগিতে হইলে এগুলির জলে গলিয়া যাওয়া দরকার। ইহা কিরূপে হয় বলিতেছি। তোমরা শুধু চিড়া মুখে দিয়া চিবাইতে থাকিলে দেখিবে, ক্রমশঃ মুখে মিষ্ট আস্বাদ লাগিতেছে। লালারসে এক প্রকার জারক পদার্থ থাকে। ইহা চিড়ার শ্বেতসারকে এক প্রকার শর্করাতে পরিণত করে। আমাদের অন্ত্রের মধ্যেও এক প্রকার জারক রস আছে। উহা ঐ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে। শেযোক্ত পদার্থ কিন্তু আখের চিনি নয়—আঙুরের মধ্যে যে চিনি থাকে, ইহা সেই চিনি ; ইহাকেই

ইংরেজীতে বলে গ্লুকোজ। লালার ক্রিয়াতে অবশ্য সোজাসুজি আঙুরচিনি বা গ্লুকোজ হয় না। অন্ত্রের মধ্যেই গ্লুকোজ হয় এবং সেখান হইতে শরীরের রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। শিরা-উপশিরার রক্তস্রোতের সাহায্যে গ্লুকোজ শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং উহা রূপান্তরিত হইয়া কার্বনডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণত হইবার সময় শরীরের শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে।

ভাত রুটি প্রভৃতি পরিপাকান্তে গ্লুকোজে পরিণত হয় বলিয়া জানিলে। তোমরা অনেকে বাজারের কৌটায় করিয়া আনা গ্লুকোজ দেখিয়া থাকিবে। এই গ্লুকোজ তৈরি হয় সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টার শ্বেতসার হইতে রাসায়নিক উপায়ে। জার্মানিতে কাঠ হইতেও গ্লুকোজ তৈরি করার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় সে দেশে এই উপায়ে প্রভূত পরিমাণে গ্লুকোজ প্রস্তুত করা হইত। অসুস্থ অবস্থায় রোগী যখন ভাত-রুটি হজম করিতে পারে না তখন তাহাকে গ্লুকোজ খাওয়ান হয়।

প্রতিবৎসর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার গ্লুকোজ বিদেশ থেকে আসে। খাদ্যশস্যের অনটনবশতঃ আমাদের দেশে জার্মান প্রণালীতে কাঠ হইতে গ্লুকোজ তৈরির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আশা করা যায়, রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতঃ তোমাদের মধ্যেই কেহ কেহ দেশে গ্লুকোজ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা খ্যাতি এবং অর্থ লাভ করিয়া দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করিবে।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে, আহারের পর যখন

অনেকটা গ্লুকোজ রক্তস্রোতে প্রবেশ করে, তখন আবশ্যকের চেয়ে বেশী অংশ প্রাণীর যকৃতের মধ্যে অন্য আকারে সঞ্চিত হয় এবং সেখান হইতে উহা আবশ্যকমত গ্লুকোজে পুনঃ পরিবর্তিত হইয়া শরীরের কাজে লাগে। গ্লুকোজের এই পরিবর্তিত রূপকে বলা হয় গ্লাইকোজেন।

সিদ্ধ চাউলের ভাত আতপ চাউলের ভাত অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয়। কলছাঁটা সিদ্ধ চাউলে কলছাঁটা আতপ চাউল অপেক্ষা ভিটামিনও বেশী থাকে। কার্বোহাইড্রেট পদার্থকে শরীরের কাজে লাগাইতে বি ভিটামিন খুব দরকার। দুধের মধ্যে যে চিনি থাকে তাহাকে ল্যাক্‌টোজ বলে। ডালের মধ্যেও অনেকটা শ্বেতসার থাকে। গোলআলু, মানকচু, কাঁচাকলা প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট শ্বেতসার থাকে। পাকা কলা, আম, কাঁঠাল, আঙুর, খেজুর, কিসমিস প্রভৃতি মিষ্ট ফলে যে অনেক প্রকার চিনি থাকে—তাহা আগেই বলিয়াছি।

শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য যত চিবাইয়া খাওয়া যায়,ততই পরিপাকের সুবিধা হয়। সুসিদ্ধ ঝরঝরে ভাত 'গলা' ভাতের চেয়ে বেশী সহজে পরিপাক করা যায়, কারণ ঝরঝরে ভাত চিবানো যায় বেশী। ক্ষুদ্রকণায় বিভক্ত ভুক্তদ্রব্যের মধ্যে জারকরসগুলি সহজে মিশিতে পারে। তারপর চিবাইবার সময় মুখের লালারসের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকিলে শ্বেতসার আংশিক পরিপাক হওয়ায় অন্ত্রের জারকরসের ক্রিয়াও উহার উপর সহজে ও সুন্দরভাবে হইতে পারে।

কার্বোহাইড্রেট শরীরের মধ্যে স্নেহপদার্থে পরিণত হইতে

পারে। গরু প্রভৃতি প্রাণীর শরীরের মেদ মুখ্যতঃ কার্বোহাইড্রেট পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়।

অনেকে বাঙালীর হীনস্বাস্থ্যের জন্য ভাতের দোষ দিয়া থাকেন—রুটি খাইবার পরামর্শ দেন। কিন্তু ইহার খুব সঙ্গত কারণ নাই। বাঙালীর আহার্যে মাছমাংসের ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই তাহার হীনস্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। নিজের ক্ষেতে উৎপন্ন ধান বেচিয়া আটা কিনিবার দরকার নাই। তবে যাঁহারা চালও কিনিয়া খান, তাঁহাদের পক্ষে এক বেলা আটার রুটি খাওয়া মন্দ নয়। আর একটি কথা, দায়িত্ব-বোধশূন্য ব্যবসায়ী আটার সহিত নানারূপ ভেজাল যেরূপ সহজে মিশাইতে পারে, চাউলে সেরূপ ভেজাল মিশাইবার আশঙ্কা কম। ভাতের ফেনের সঙ্গে উপকারী বি ভিটামিন সাধারণতঃ ফেলিয়া দেওয়া হয়, পক্ষান্তরে আটার বি ভিটামিনের সেরূপ অপচয়ের আশঙ্কা নাই।

এই অধ্যায়ে তোমরা জানিলে যে, চাউল আটার মত গোল আলু, রাঙা আলু, কাঁচাকলা, মানকচু প্রভৃতির মধ্যেও কার্বোহাই-ড্রেট যথেষ্ট থাকে। সুতরাং এগুলি বেশী খাইলে চাউল আটার বরাদ্দ অনেকটা কমান যায়। ফলতঃ বিলাত, জার্মানি প্রভৃতি দেশের লোকেরা আলু বেশী খায় বলিয়া অল্প রুটিতেই তাহাদের দিন চলিয়া যায়। চাউল বা আটা যোগাড় করা শক্ত হইলে গোল আলু প্রভৃতি বেশী করিয়া খাইতে তোমরা আপত্তি করিবে না নিশ্চয়ই। অবশ্য গোল আলু, রাঙা আলু প্রভৃতি সস্তায় পাওয়াও দরকার।

স্নেহপদার্থ

পূর্বেই বলিয়াছি সরিষা, তিল, বাদাম, নারিকেল, জলপাই প্রভৃতির তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ও মাছের তেল স্নেহ-পদার্থের অন্তর্গত। স্নেহপদার্থের প্রধান ক্রিয়া শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। কার্বোহাইড্রেটও শক্তিপ্রদ। তথাপি ইহাদের যে কোনটি একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। কার্বো-হাইড্রেট না খাইয়া শুধু ঘি বা তৈলে বাঁচা যায় না। স্নেহ-পদার্থ কার্বোহাইড্রেটের সংযোগে ভালরূপে পরিপাক হয়।

মলের কাঠিন্য দূর করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতেও স্নেহ-পদার্থ দরকার। প্রাণীজ স্নেহপদার্থ—ডিমের তৈলাংশ ও মাছের তেলে ভিটামিন এ ও ডি থাকে। সুতরাং শরীর-রক্ষায় শুধু সরিষা, তিল, নারিকেল তেল যথেষ্ট নয়। তারপর শাকসব্‌জিতে যে ক্যারোটিন নামে পদার্থ থাকে, তাহা তেলে দ্রব বলিয়া স্নেহপদার্থ ব্যতিরেকে উহা খাইলে শরীরের কাজে লাগিতে পারে না। ক্যারোটিন পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে ভিটামিন এ'তে পরিণত হয়। সমান পরিমাণ আটা বা চাল অপেক্ষা তেলে বেশী শক্তি উৎপাদন করে, এজন্য যাঁহারা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে তেল-ঘি খাওয়া নিতান্ত দরকার। অভাবে ভঁয়ষা ঘি, বাদাম তেল, তিল তেল খাওয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যহ খানিকটা নারিকেল বা চীনাবাদাম খাইলে অনেকটা স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়। প্রাণীজ স্নেহপদার্থ—মাখন, ঘি, মাছের তেল প্রভৃতিতে ভিটামিন এ এবং ডি থাকার দরুন এগুলি উদ্ভিজ্জ তৈলের চেয়ে বেশী উপকারী।

কেরোসিন বা তরল প্যারাফিন স্নেহপদার্থের মধ্যে পড়ে না। উহারা শরীরের কাজেও লাগে না।

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে আজকাল ঘি মাখনের কথা মুখে আনাই দায়। সুতরাং পুঁটি প্রভৃতি মাছ খাইলে তাঁহারা কিছু প্রাণীজ স্নেহপদার্থ পাইতে পারেন। মাছের তেলও সস্তায় পাইলে মাঝে মাঝে বাড়িতে আনা ভাল।

প্রোটিন

দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা প্রভৃতিতে প্রোটিন বা আমিষপদার্থ বেশী পরিমাণে থাকে। তরিতরকারি, আটা চাল ও ফলমূলেও ইহা সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে প্রোটিন-প্রধান খাদ্যই দুর্মূল্য। মাছ-মাংস, ডিম, ছানার কথা তোমরা সকলেই জান। ডালের শতকরা প্রায় ২০।২৫ অংশ প্রোটিন থাকে। তবে সে প্রোটিন মাছমাংস ডিম বা ছানার মত উচ্চাঙ্গের প্রোটিন নয়।

প্রোটিনের মধ্যে ভালমন্দ আছে। যে প্রোটিন আমাদের শরীরগঠনে বেশী নিয়োজিত হয়, সেই প্রোটিন অন্য প্রোটিনের চেয়ে বেশী ভাল। চালের প্রোটিন আটার প্রোটিনের চেয়ে ভাল। দুধের প্রোটিন বা ছানা খুব উচ্চাঙ্গের। তারপর ডিম বা মাছমাংসের প্রোটিন। ডাল বা তরিতরকারীর প্রোটিন শরীরগঠনে তত সহায়ক নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রোটিনের

প্রধান কার্য গঠনমূলক। প্রাণীজ প্রোটিনের আর একটি গুণ এই যে, উহার সহিত ভিটামিন এবং অনেক প্রকার লবণ-পদার্থও মিশ্রিত থাকে এবং উহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি করায়, পরিপাক ক্রিয়াও ভালভাবে হয়। খাদ্য-বিষয়ে যাঁহাদের ভাল জানাশুনা আছে, তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, প্রাণীজ প্রোটিন শরীররক্ষায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। দেখা যায়, যে জাতির মধ্যে প্রাণীজ প্রোটিনের প্রচলন পর্যাপ্ত, তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব শৌর্যবীর্য অল্প-প্রোটিন-ভোজী বা নিরামিষাশী জাতির তুলনায় অনেক বেশী। স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অসম্ভব শক্তিমান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ভীম নাগের সন্দেশ খাইতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সন্দেশের প্রধান উপাদান ছানা। ছানা যে উচ্চস্তরের প্রোটিন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

শরীরের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পরিপাক-সহায়ক যাবতীয় জারকরস প্রধানতঃ প্রোটিন-জাতীয়। সুতরাং ইহাদের গঠনের জন্য প্রত্যহ খাদ্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত প্রোটিন থাকা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

শরীর রক্ষায় আমিষ খাদ্য সবচেয়ে দরকারী। দুধ ডিম যোগাড় করিতে না পারিলে—কুচোচিংড়ি, পুঁটি, টাকি প্রভৃতি যে মাছ পাওয়া যায় তাহাই খাওয়া দরকার। 'মাটির মায়া'র কবি বলিয়াছেন—

মাছ ত কেবল জলেই করে না খেলা
খেলে বাঙালীর স্মৃতি-সরে সারা বেলা।

মাছভাতে বাড়ে বাঙালীর গায়ে বল,
তাই তাজা মাছ দেখে আসে জিভে জল।

ইহা হইতে তোমরা মাছের উপকারিতার কথা মনে রাখিতে পারিবে।

প্রোটিনগুলি পাকস্থলীর রসে আংশিক জীর্ণ হয় ও পরে অন্ত্রের জারকরসের ক্রিয়াতে আরও ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। বৃকোদর প্রভৃতি কথা হইতে অনেকের ধারণা যে, জঠরে অগ্নি আছে এবং সেই অগ্নিতে খাদ্য-পরিপাক হইতেছে। জঠরে বাস্তবিকপক্ষে কোন অগ্নি নাই, পরন্তু কয়েক প্রকার জারকরস আছে। ইহাদের সাহায্যে মাংসও শেষে এমন বস্তুতে রূপান্তরিত হয় যে, তাহা চিনির মত জলে গলিয়া যায়।

প্রোটিন হইতে উৎপন্ন এই পদার্থগুলিকে বলে অ্যামিনো অ্যাসিড। জলে দ্রব অবস্থায় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি রক্তে প্রবেশ করিয়া শরীরের পেশী, রক্তকণিকা প্রভৃতি গঠন করে।

মাংস খাইলে শরীর গরম হয়। মাংস যেসব জলে-দ্রব পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি রক্তস্রোতে প্রবিষ্ট হইলে শরীরের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট তাড়াতাড়ি রূপান্তরিত হওয়ায় বেশী উত্তাপ অনুভূত হয়। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে ভয়ের কারণ নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, গঠনমূলক কার্যের অপেক্ষা বেশী প্রোটিন আহার করিলে উদ্‌বৃত্ত অংশ কার্বোহাইড্রেট বা স্নেহপদার্থের মত শরীরের শক্তি-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। শরীরের মধ্যে

এই প্রোটিন কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তরিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঘেরা শুধু মাংস খাইয়া বাঁচে। এস্কিমো জাতির খাদ্যের অধিকাংশই প্রোটিন, তাহা তোমরা হয়ত শুনিয়াছ। বেশী প্রোটিন আহারেও ইহাদের অপকার করে না, বরং ভাত-রুটির কাজ অনেকটা শুধু মাছমাংসেই ইহারা পোষাইয়া লয়।

বয়স্ক লোকের প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে এক ছটাক প্রোটিন প্রয়োজন এবং উহার অধিকাংশই প্রাণীজ প্রোটিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সচরাচর প্রায় পাঁচ ছটাক মাছ বা মাংসে এক ছটাক প্রোটিন থাকে। কারণ মাছ-মাংসে জলই থাকে বেশী।

মাংসে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। আহারের সময় শাকসবজি ও ফলমূল খাইলে মাংস আহারে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মাইতে পারে না। প্রোটিনের অল্পতায় বা অভাবে অম্লরোগ জন্মে, কারণ পাকস্থলীর প্রোটিন-জীর্ণকারী জারকরস যদি ক্রমাগত অনেকদিন কোনও আমিষ খাদ্য না পায়, তবে উহা অম্ল জন্মায়। প্রোটিনযুক্ত খাদ্য ভাল পরিপাক না হইলে উহা অন্ত্রের মধ্যে পচিয়া দূষিত পদার্থ উৎপন্ন করে এবং তাহাতে খোস পাঁচড়া প্রভৃতি জন্মিতে পারে।

মাছ বা ডিম বেশী ভাজা হইলে উহার উপরের অংশ চামড়ার মত শক্ত হওয়ায় হজমে বিলম্ব ঘটে। আমিষ খাদ্য বেশী খাওয়া হইলে পেঁপে বা আনারস খাইলে হজমের সুবিধা হয়। কাঁচা পেঁপে কাটিলে যে দুধের মত রস বাহির হয়, ঐ রসের মধ্যে মাংস পরিপাক করিতে পারে এরূপ জারক পদার্থ থাকে। ভুট্টা, আলু, চাউল প্রভৃতির শ্বেতসারকে রাসায়নিক উপায়ে

গ্লুকোজে পরিণত করা হয় এবং পরিপাকশক্তির দৌর্বল্যে রোগীকে গ্লুকোজ খাওয়ান বা ইনজেকশন দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা তোমরা অনেকেই জান। পেঁপের জারক পদার্থ প্যাপেন সংযোগে মাংস হইতেও (আংশিক জীর্ণ করিয়া) পলিপেপটাইড, পেপটোন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতি করা হইতেছে। যখন রোগী কোনও আমিষ পদার্থ হজম করিতে পারে না, তখন এগুলি খাওয়ান বা ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই আবিষ্কার খুব অল্পদিনের। ইংরেজীতে এই পদার্থকে বলা হয় প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় অনেক মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে ইহার প্রয়োগে বাঁচান হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন অধুনা সেনট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। ঐ সময় তিনি বায়োকেমিক্যাল স্ট্যাণ্ডার্ডিজেশন ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সেইখানেই উহা প্রথম প্রস্তুত ও পরীক্ষা করেন।

বৃদ্ধদের অপেক্ষা বাড়তির বয়সে প্রোটিন অনেক বেশী দরকার। প্রসূতি এবং অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদেরও আমিষ খাদ্য বেশী আবশ্যক।

বার্ধক্যে শরীরের গঠনক্রিয়া স্থগিত হয়; কেবল মাত্র ক্ষতি-পূরণের জন্য আমিষ খাদ্যের উপযোগিতা স্বভাবতই অল্প। ডিম এবং মাখনের কোলেস্টেরল নামক তৈলজাতীয় উপাদান বাড়তির বয়সে দ্রুতবর্ধমান পেশীর গঠনে নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু শেষ বয়সে উহা বিশেষ শঙ্কার কারণ। রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ ইহার জন্য জন্মিতে পারে। বেশী বয়সে স্নেহজাতীয়

এবং শ্বেতসারপ্রধান খাদ্যও পরিমিত মাত্রায় আহার করা বিধেয়। যিনি বাল্যে ও যৌবনে যথেষ্ট প্রাণীজ আমিষ খাইতে অভ্যস্ত, তাঁহাকেও ৫০ বৎসরের পরে মাংস-ডিম্বাদির মাত্রা কমাইতে হইবে। বৃদ্ধ বয়সে ফলমূল, দুধ ও টাটকা শাকসবজির প্রতি বেশী মনোযোগ দিলে নীরোগ দীর্ঘ জীবন লাভের পথ প্রশস্ত হয়। মহাকবি গ্যেটে তাঁহার ফাউস্ট কাব্যে লিখিয়াছেন, এইরূপ খাদ্যের সঙ্গে পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম সংযুক্ত হইলে বৃদ্ধবয়সে পুনর্যৌবন লাভ করা যায়। গ্যেটে সম্ভবতঃ নিজের জীবনে ইহা প্রতিপালন করিতেন। কারণ তিনি সুস্থদেহে ৮৩ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। ১৮৩২ সালে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

ভিটামিন

ভিটামিন কথাটি আজকাল খুবই পরিচিত, কিন্তু ভিটামিন সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান অনেকেরই কম। কাহারও মতে উহা একটি বিশ্বাস মাত্র—আদৌ ভিটামিন বলিয়া কোন বস্তু নাই। অনেকে আবার ভিটামিনই সব ভাবিয়া খাদ্যের অন্যান্য উপাদান অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যত কিছু ব্যারাম-পীড়া, যত প্রকারের জাতীয় স্বাস্থ্যহীনতা সবই ভিটামিনের অভাবে হইতেছে বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। এই শ্রেণীর লোকের কলা ফেলিয়া কলার খোসার প্রতি সমধিক টান!

২

ভিটামিন শুধু নাম নয়—বিশুদ্ধ ভিটামিন চিনি প্রভৃতি জিনিসের মতই চোখে দেখা যায়, তবে এখনও উহা ডাক্তারের দোকানেই আছে, মুদীর দোকানে নামে নাই। এযাবৎ অনেকগুলি ভিটামিনের বিষয় জানা গিয়াছে। প্রত্যেকটির ক্রিয়া পৃথক এবং কার্বোহাইড্রেট, তেল ও প্রোটিন-পদার্থ-সংযুক্ত খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে উহারা থাকে। পূর্বে ডাক্তারী দোকানে বিশুদ্ধ ভিটামিন পাওয়া যায় বলিলাম। সেগুলি রাসায়নিক উপায়ে জীব বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ হইতে সংগ্রহ করা বা রাসায়নিক কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা।

প্রকৃতি অনুসারে ভিটামিন মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত—জলে-দ্রব ভিটামিন ও তেলে-দ্রব ভিটামিন, অর্থাৎ কতকগুলি জলের মধ্যে মিশিয়া যায়—যেমন চিনি জলে গলে; অপর কতকগুলি তেলের মধ্যে গলে—যেমন তেলে কোন কোন রং গলিয়া মিশিয়া যায়। আবিষ্কারের প্রথম যুগে ভিটামিনগুলি ইংরেজী বর্ণমালার নাম অনুসারে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। এখন অনেকগুলির রাসায়নিক নামকরণ হইয়াছে।

জলে-দ্রব ভিটামিন—ভিটামিন বি$_১$, বি$_২$, প্রভৃতি এবং সি

তেলে-দ্রব ভিটামিন—ভিটামিন এ, ডি, ই, কে।

তোমরা অনেকেই জান যে, ভিটামিনের আবিষ্কার খুব অল্প দিনের। হয়তো আশ্চর্য হইবে যে, এত দরকারী জিনিসের কথা না জানিয়াও আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি করিয়া সুস্থদেহে দীর্ঘজীবী হইতেন। তাহার প্রধান কারণ, তখন দেশে দুধ

মাছ প্রভৃতির অভাব ছিল না, আর ভিটামিনগুলির বাহনই তো ঐ সব সুখাদ্য। বর্তমান সভ্যতার কৃত্রিমতার যুগ না আসিলে বোধ করি ভিটামিনের আবিষ্কারই হইত না।

ইহার আবিষ্কারের কথা বড় আশ্চর্য। যবদ্বীপে এবং জাপান প্রভৃতি দেশে কলছাঁটা চাউল খাইতে আরম্ভ করায়, সেখানে লোকদের মধ্যে একরকম ব্যারাম দেখা যায়, তাহাকে বেরিবেরি বলে। যবদ্বীপের ডাক্তার আইকম্যান দেখিলেন যে, ঢেঁকিছাঁটা চাউলে ঐ ব্যারাম হয় না। তখন বুদ্ধিমান ডাক্তার স্থির করিলেন—কলে বেশী ছাঁটা হয় এবং ছাঁটিবার সময় চাউলের উপরের অংশে যে লাল পর্দা থাকে, তাহা উঠিয়া যাওয়ায় উহার অভাবেই ঐ রোগ জন্মে। তিনি কলছাঁটা চাউলের সহিত ঐ কুঁড়া মিশাইয়া লোকদের খাইতে দিয়া দেখিলেন, তাহাদের ঐ ব্যারাম হয় না। তারপর তিনি পায়রার উপর পরীক্ষা করিয়াও দেখিলেন, পায়রাদের কলছাঁটা চাউলে বেরিবেরির মত ব্যারাম হয়, কিন্তু গোটা চাউলে ঐ ব্যারাম সারে। এই গেল ভিটামিন বি'র আবিষ্কার-কথা।

তারপর বিলাতের ডাক্তার হপ্‌কিন্স রাসায়নিক উপায়ে প্রাপ্ত খাদ্যের বিশুদ্ধ উপাদান ইঁদুরকে খাওয়াইয়া দেখিলেন, ঐ খাদ্যে ইঁদুর মরিয়া যায়; কিন্তু তাহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ খাইতে দিলে সেগুলি বাঁচিয়া ওঠে। দুধের বদলে কডলিভার তেল দিলেও বাঁচে। এই হইতে তেলে-দ্রব ভিটামিন-এ'র আবিষ্কার। তোমরা জানিয়া খুশী হইবে যে, এই আবিষ্কারের জন্য উভয়েই ১৯২৯ সালে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

প্রাচীন কাল হইতেই জানা ছিল, নাবিকদের স্কার্ভি নামে এক মারাত্মক রোগ হইত। গাঁটে গাঁটে বেদনা, দাঁত দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শাকপাতা, লেবুর রস প্রভৃতি খাইলে ইহা সারিয়া যাইত। ক্রমে বুঝা গেল, এই সব টাট্‌কা জিনিসে জলে-দ্রব এক প্রকার ভিটামিন আছে—ইহার নাম ভিটামিন 'সি' দেওয়া হইল। হাঙ্গেরীর রাসায়নিক সেণ্ট গর্গি ঐ দেশের প্যাপ্রিকা নামক লঙ্কাজাতীয় ফল হইতে উহা বিশুদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তোমরা হয়তো ভাবিবে, এ আর এমন কি কাজ যার জন্য নোবেল প্রাইজ! কিন্তু একটি কথা মনে রাখিবে যে, এই পদার্থগুলি এত অল্প মাত্রায় থাকে এবং ইহারা এত শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় যে, ইহাদিগকে পৃথক করা এবং ঠিকমত ধরা এক অমানুষিক ব্যাপার। বড় হইয়া তোমরা যখন এই সব বিষয় পড়িবে, তখন ইঁহাদের অসাধারণ শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইবে। এখানে আমি এই পর্যন্ত বলিয়া পরিচিত ভিটামিনগুলির সম্বন্ধে এ যাবৎ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি।

ভিটামিন এ

পূর্বেই বলিয়াছি, ভিটামিন এ তেলে-দ্রব পদার্থ। সাধারণতঃ প্রাণীর যকৃতের তেলে ইহা থাকে। কডমাছের যকৃৎ বা লিভার তেলের প্রচলন ভিটামিন আবিষ্কারের বহু

পূর্বকাল হইতেই ছিল। আগে ভারতবর্ষের সামুদ্রিক মাছের তেলও ইয়োরোপে চালান যাইত। আমাদের দেশের রুই, চাঁই, চিতল, বোয়াল, শোল, কাতলা, মৃগেল, আড়, ইলিশ প্রভৃতি মাছের লিভার তেলে এই ভিটামিন থাকে। প্রাণীর যকৃৎ ভিন্ন নাড়ী-ভুঁড়িতেও এই ভিটামিন থাকে। মাছের গায়ের তেলে সাধারণতঃ এই ভিটামিন থাকে না, প্রাণীর চর্বিও ভিটামিন এ-বর্জিত।

ভিটামিন এ'র অভাবে রাতকানা রোগ ও চোখের নানা-প্রকার রোগ জন্মে। অন্য ব্যাধির আক্রমণ রোধ করিতেও ভিটামিন এ'র উপকারিতা আছে বলিয়া জানা যায়।

আমাদের দেশে বহুকাল পূর্বেই জানা ছিল যে, পাঁঠার মেটে ও মাছের তেলে রাতকানা ব্যারাম সারে। ভিটামিন এ আবিষ্কারের পর এখন আমরা উহার অর্থ বুঝিতেছি।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে, ভিটামিন এ'র মূলতঃ উৎপত্তি উদ্ভিদে। গাছের কচি পাতার মধ্যে, গাজর, টম্যাটো, আম, পাকালঙ্কা প্রভৃতির মধ্যে ক্যারোটিন নামে পদার্থ থাকে। এই পদার্থ প্রাণীর খাবারের সহিত উদরস্থ হইলে তাহার ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে উহা ভিটামিন এ'তে পরিণত হয়। শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী পরিমাণে এই ভিটামিন তৈরি হইলে উহা প্রাণীর যকৃতে সঞ্চিত হয়।

গরু ঘাস খায়। ঘাসে ক্যারোটিন থাকে। ক্যারোটিনের কতকটা গরুর ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ভিটামিন এ'তে পরিবর্তিত হয়—অবশিষ্ট অংশ ক্যারোটিনরূপেই তাহার রক্তে থাকে। গরুর

দুধে ঐ ভিটামিন এবং ক্যারোটিন দুইটিই থাকে। মাখনের পীতাভ রং ক্যারোটিনের জন্য। ভিটামিন এ কিন্তু বর্ণহীন দানাদার পদার্থ। গরু যত টাটকা কাঁচা ঘাস খায়, তাহার দুধে তত বেশী ভিটামিন এ পাওয়া যায়। মাখন-তোলা দুধে এই ভিটামিন থাকে না। কারণ, উহা মাখনের সহিতই চলিয়া যায়।

মাছেরা নানাবিধ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য খায়, তাহার সহিত ক্যারোটিন পায় এবং উহা তাহাদের যকৃতে ভিটামিন এ-রূপে সঞ্চিত হয়। কড প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছ উদ্ভিদ্ কোথায় পায়? দেখা গিয়াছে, সমুদ্রের উপরিভাগে ছোট ছোট উদ্ভিদ (অ্যালগি, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন) ভাসিয়া বেড়ায়। ছোট কড ও অন্যান্য মাছগুলি উহা খায় এবং সেই ক্যারোটিন মাছের শরীরে ভিটামিন এ'তে পরিণত হয়। গভীর জলের মাছেরা ছোট ছোট মাছ খায়, সুতরাং তাহাদের যকৃতে সঞ্চিত ভিটামিন এ বড় মাছগুলি পাইয়া থাকে। এইরূপে মাছ যত বড় হইতে থাকে, ততই দিন দিন তাহার যকৃতে ভিটামিন এ'র সঞ্চয় বাড়িতে থাকে।

গুগলি, ঘাস, শেওলা প্রভৃতি খাইলে হাঁসের ডিমে ভিটামিন এ বেশী হয়। ইউরোপে মুরগিকে কডলিভার তেল খাওয়াইয়া উহার ডিমের ভিটামিন এ'র পরিমাণ বাড়ান হইয়া থাকে।

আমরা প্রাণীজ খাদ্য, মাখন, ডিম, মাছের তেল প্রভৃতি হইতে ভিটামিন এ পাইয়া থাকি। আবার পালং, নটে ও

বিবিধ শাক, আম, টম্যাটো, লঙ্কা প্রভৃতি ফল হইতে ক্যারোটিন পাইয়া থাকি। ক্যারোটিন তেলে দ্রব হয়। সুতরাং শাক-সবজির সহিত উপযুক্ত পরিমাণে স্নেহপদার্থ না খাইলে ক্যারোটিন শরীরে গৃহীত হইতে পারে না। অন্যান্য তেলের চেয়ে ঘিতে ক্যারোটিন বেশী গৃহীত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। শাকসব্জি যত কচি হয়, উহাতে ক্যারোটিনও তত বেশী থাকে। মাছ যত বড় হয়, উহার যকৃতে ভিটামিন এ'র পরিমাণ তত বেশী হয়।

আমাদের দেশী মাছ রুই, কাতলা, আড়, চিতল, ঢাঁই, মৃগেল, শোল, ইলিশ প্রভৃতি মাছের তেলে ভিটামিন এ খুব আছে। পুঁটি, ট্যাংরা, মৌরালা, বাটা, বেলে, চাঁদা, পারশে, পাবদা, খলসে, কই প্রভৃতি ছোট মাছ খাইলেও অনেকটা ভিটামিন এ পাওয়া যায়।

ভিটামিন এ উত্তাপে নষ্ট হয়। তবে যত বিশুদ্ধ অবস্থায় উহা থাকে, উত্তাপে, বিশেষতঃ বাতাসের সংস্পর্শে তাপ দিলে উহা তত শীঘ্র নষ্ট হয়। স্বভাবজাত খাদ্যের ক্যারোটিন বা ভিটামিন এ এরূপ রক্ষিতভাবে থাকে যে, উহা সাধারণ রান্নার তাপে বিশেষ নষ্ট হয় না। ঘি অপেক্ষা মাখনে ভিটামিন এ বেশী থাকে; কারণ মাখন জ্বাল দিয়া ঘি করিবার সময় কিছুটা ভিটামিন উত্তাপে নষ্ট হয়। রৌদ্রের মধ্যে যে আলট্রাভায়লেট রশ্মি (বেগনিপারের আলো) থাকে, তাহার ক্রিয়ায় ভিটামিন এ নষ্ট হয়। এজন্য সাদা কাচের পাত্রে ঘি রাখা উচিত নয়। মাটির পাত্র বা অন্য কোন অস্বচ্ছ পাত্রে ঘি রাখা ভাল।

এক সময়ে বেশী পরিমাণে ভিটামিন এ খাওয়া হইলে, উহা যকৃতে সঞ্চিত থাকিয়া শরীরের চাহিদা মিটাইতে পারে। এই ভিটামিন বেশী ব্যবহারে শরীরের ক্ষতি হয় না। বয়স্ক লোকের প্রত্যহ কতটা ভিটামিন এ বা ক্যারোটিন প্রয়োজন, তাহা পরে বলা হইয়াছে। শরীরের সুস্থতায় অপরিহার্য এই মহদুপকারী পদার্থ যাহাতে প্রতিদিন খাদ্যের সঙ্গে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

ভিটামিন বি

বি-ভিটামিন বলিতে আজকাল কোন একটিমাত্র পদার্থকে বুঝায় না, অনেকগুলি জলে-দ্রব ভিটামিনের সমষ্টিকে ভিটামিন বি বলে। সাতটি বিভিন্ন বি ভিটামিনের কথা জানা গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভিটামিন $বি_১$, ভিটামিন $বি_২$, $বি_৬$ ও নিকোটিনিক অ্যাসিড মাত্র মানুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কার্বোহাইড্রেট খাদ্য শরীরের কাজে লাগাইতে ভিটামিন $বি_১$-এর প্রয়োজন। একারণ কার্বোহাইড্রেট খাদ্য বেশী খাইলে সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন $বি_১$ও বেশী খাওয়ার প্রয়োজন। ভিটামিন $বি_১$-এর অভাবে ক্ষুধা কমিয়া যায়। স্নায়বিক সুস্থতা-রক্ষায় ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ভালভাবে পরিচালনা করিতেও ইহার প্রভাব বিদ্যমান। পরিপাকশক্তির সহায়ক জারকরস নিঃস্রাবে ভিটামিন $বি_১$ প্রয়োজনীয় বলিয়া জানা গিয়াছে। মানুষের

বৃহদন্ত্রের মধ্যে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন বি$_1$ তৈরি হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। পেটের অসুখ বমি প্রভৃতিতে ভুক্ত পদার্থের ভিটামিন বি$_1$ শরীরের কাজে লাগিতে পারে না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এবং শিশুকে স্তন্যদানকালে মেয়েদের এই ভিটামিন বেশী আবশ্যক। সালফোন অ্যামাইড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার-কালে এবং অত্যধিক গরমের সময় ইহার চাহিদা বেশী হয়। তারপর কার্বোহাইড্রেট বেশী খাইলে এই ভিটামিনও সেই অনুপাতে বেশী দরকার হয়।

এই মহা উপকারী পদার্থ আজকাল রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। পূর্বে ইহা চাউলের কুঁড়া হইতে প্রস্তুত হইত। ইহাকে ইংরেজীতে এনিউরিন বা থিয়ামিন বলে। ইহার সম্পূর্ণ অভাবে বেরিবেরি জন্মে। আমাদের দেশে এপিডেমিক ড্রপসিকে চলতি ভাষায় বেরিবেরি বলে। প্রকৃত বেরিবেরি আমাদের দেশে বড় একটা হয় না। সরিষার তেলের একটি ভেজালের জন্য এপিডেমিক ড্রপসি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্বে যবদ্বীপ, জাপান প্রভৃতি দেশে বেরিবেরি রোগে বহু লোক মারা যাইত। ভিটামিন বি$_1$ প্রয়োগে এখন ঐ ব্যাধির সমূলে বিনাশ হইয়াছে।

ভিটামিন বি$_1$ যেরূপ একটি মাত্র পদার্থ, ভিটামিন বি$_2$ কিন্তু সেরূপ নয়। রিবোফ্ল্যাভিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড ও অপর একটি পদার্থকে একযোগে ভিটামিন বি$_2$ বলে। ভিটামিন বি$_2$ এর সম্পূর্ণ অভাবে পেলাগ্রা নামে মারাত্মক চর্মরোগ জন্মে। পূর্বে ইটালি, মিশর প্রভৃতি দেশে এই ব্যারাম খুব হইত।

আমাদের দেশে পেলাগ্রা নাই বলিলেই চলে। দুধ, ডিম, মাছ, প্রাণীর যকৃৎ, বাঁধাকপি, ছানার জল, বেগুন, শাঁখআলু প্রভৃতিতে ভিটামিন বি$_2$ বেশী থাকে। শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার জন্য বি$_2$ বিশেষ উপকারী।

বি-ভিটামিনগুলি চালের কুঁড়ায়, আটাতে, আমাদের পরিচিত বিভিন্ন ডালে, শাঁখআলু, পোস্ত, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি গোলআলু ও শাকসবজিতে পাওয়া যায়। প্রাণীর যকৃৎ, মাংস, ডিম, ছানার জল এবং ঘোলেও উহা থাকে। ভিটামিন বিও উদ্ভিদের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতেই উহা প্রাণিদেহে প্রবেশ করে।

এই ভিটামিন রান্নার উত্তাপে নষ্ট হয় না। তবে রান্নার সময় ডালে সোডা দিলে উহার বি$_1$ ও বি$_2$ নষ্ট হইয়া যায়।

ঢেঁকিছাঁটা চাল, চিড়ামুড়ি, গুড়, ডাল ও ডিম—এই ভিটামিনের প্রধান উৎস। সিদ্ধ চাউলে আতপ চাউল অপেক্ষা এবং ঢেঁকিছাঁটা চাউলে কলছাঁটা চাউল অপেক্ষা বি-ভিটামিন বেশী থাকে। ফেন ফেলিয়া দিলে উহার সহিত অনেকটা বি-ভিটামিন নষ্ট হয়। তবে বাড়িতে দুগ্ধবতী গাভী থাকিলে তাহাকে ঐ ফেন খাইতে দিয়া ঐ ভিটামিনের অনেকটা আবার দুধের সঙ্গে ফিরিয়া পাওয়া যায়।

যাঁহারা মনে করেন, ভিটামিন পাইতে হইলে সব জিনিসই কাঁচা খাইতে হইবে, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, ভাজা চিড়াতে অবধি বি-ভিটামিন পাওয়া যায়। আমাদের ল্যাবরেটরিতে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

আমাদের দেশে ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলেও যে বেরিবেরি হয় না, তাহার প্রধান কারণ আমরা প্রত্যহই মুগ, মসুর, মটর ও অন্যান্য ডাল এবং শাকসবজি, আলু, বেগুন কপি প্রভৃতি খাইয়া থাকি। এই সব আহার্যে বি-ভিটামিন পাইয়া থাকি। ভিটামিন এ'র মত বি-ভিটামিন শরীরে সঞ্চিত হয় না, সুতরাং দৈনিক খাদ্যের সহিত ইহা থাকা দরকার। বি-ভিটামিন প্রত্যহ কতটা দরকার, তাহা পরে বলা হইবে। বি-ভিটামিন বেশী খাইলেও কোনও অপকার করে না। বি-ভিটামিনের ক্রিয়া প্রসঙ্গে আবার বলিতে চাই যে, ইহার অভাবে নানারূপ চর্মরোগ, বেরিবেরি প্রভৃতি জন্মে। তদ্ভিন্ন স্নায়ু দৃঢ় ও স্নিগ্ধ রাখিতে, ক্ষুধাবৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করিতে, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সুস্থতা বজায় রাখিতে এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিতেও ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ভিটামিন সি

ভিটামিন সি'র সম্পূর্ণ অভাবে স্কার্ভি নামে মারাত্মক রোগ জন্মে। শ্রমবিমুখতা, দুর্বলতা, মুখে রক্তহীনতা, দাঁতের গোড়ায় ঘা হওয়া ও রক্ত পড়া, হাত-পায়ের সন্ধিস্থলে বেদনাবোধ প্রভৃতি স্কার্ভিরোগের প্রধান লক্ষণ। সি-ভিটামিনের আংশিক অভাব আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আছে। ইহার জন্য দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তপড়া, পাইওরিয়া প্রভৃতি দন্তরোগ জন্মে। ভিটামিন সি রক্তের লালকণিকার গঠনে দরকারী।

ইহার অভাবে রক্তাল্পতা জন্মে। ব্যাধি-প্রতিরোধ করিতে এবং শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতায় ইহা অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, এমন কি ক্ষয়রোগেও ইহার ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। অসুস্থ অবস্থায় সালফোন অ্যামাইড শ্রেণীর ঔষধ ব্যবহারকালে ভিটামিন সি বেশী খাওয়া দরকার। কারণ ঐসব ঔষধের জন্য শরীরের যে ক্ষতির সম্ভাবনা, ভিটামিন সি'র বিদ্যমানে তাহা হ্রাস বা রহিত হইয়া থাকে।

বিবিধ লেবু, পেয়ারা, শশা, আঙুর, আনারস, আপেল, আম, টম্যাটো, পেঁপে, গোলআলু, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, পেঁয়াজ-কলি, অঙ্কুরিত ছোলামুগ, ডাবের জল, পাকা লঙ্কা ও শাকসবজি হইতে আমরা এই ভিটামিন পাইয়া থাকি। পরিচিত যত প্রকার ভিটামিন আছে তার মধ্যে এই ভিটামিন উত্তাপে সবচেয়ে শীঘ্র নষ্ট হয়; সুতরাং কাঁচা ফলমূল প্রভৃতি হইতেই ইহা বেশী পাওয়া যায়। পরীক্ষার ফলে এখন দেখা গিয়াছে, বিশুদ্ধ সি উত্তাপে অতি সহজে নষ্ট হয়; কিন্তু শাকসবজির ভিটামিন সি রান্নাতেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। বাঁধাকপি, টম্যাটো, লঙ্কা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া ইহা আমরা নিজেরাই দেখিয়াছি। আজকাল রাসায়নিক উপায়ে ভিটামিন সি তৈরি হইতেছে। প্রত্যহ কতটা দরকার তাহা পরে বলা হইবে। শিশু ও ছেলেমেয়েদের ইহা অপেক্ষাকৃত বেশী দরকার। এই জন্য ফলমূল তাহাদের বেশী খাওয়া প্রয়োজন। দুধে এই ভিটামিন নাই

বলিলেই চলে। এজন্য শিশুদেরও ছয় মাস বয়সের পর হইতে কমলালেবুর রস, ভাল মিষ্ট টম্যাটোর রস বা কচি ডাবের জল খাওয়ান ভাল।

প্রতিদিন শশা, নারিকেল, কলা, লেবু, পেয়ারা, টম্যাটো ও সাময়িক ফলমূল বাড়িতে যাহাতে আনা হয়, সে বিষয়ে গৃহস্থের মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। পাকা আম, পাকা টম্যাটো ও পাকা লঙ্কাতে উহাদের কাঁচা ফলের চেয়ে বেশী ভিটামিন সি থাকে। বেশী দিন ঘরে রাখিয়া দিলে ঐসব ফলের ভিটামিন সি কমিয়া যায়। পাতিলেবু, জামরুল, পেয়ারা, কলা, আমড়া, টম্যাটো প্রভৃতি ফলের উপকারিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সংগ্রহ করিলেই পরিবারের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

ভিটামিন সি যতই খাওয়া যাউক ইহা কোনও ক্ষতি করে না ; বরং তাহাতে দেহের কমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়।

বিশুদ্ধ ভিটামিন সি'র অ্যাসকরবিক অ্যাসিড অর্থাৎ স্কার্ভি প্রতিষেধক নাম দেওয়া হইয়াছে।

ফলিক অ্যাসিড

জলে দ্রব ভিটামিন-শ্রেণীর মধ্যে ফলিক অ্যাসিড বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রয়োগে অনেক দুশ্চিকিৎস্য রক্তহীনতা ব্যাধির উপশম হইতেছে। ইহা প্রথমে প্রাণীর যকৃৎ এবং ঈস্ট (সুরাবীজ) হইতে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কৃত হয়।

ইহা কমলারঙের জলে দ্রব দানাদার পদার্থ। কচি শাক সবজিতে ইহা পাওয়া যায়। ফলিক অ্যাসিডের আবিষ্কারে কচি, সবুজ শাকের মূল্য বাড়িয়াছে। শাক যত টাটকা ও সবুজ হইবে উহাতে ফলিক অ্যাসিড তত বেশী পাওয়া যাইবে। রান্নাতে এই ভিটামিন অনেকটা নষ্ট হয়। যাঁহারা রক্তাল্পতায় ভুগিতেছেন তাঁহাদের স্যালাড খাওয়া খুবই উপকারী। আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই যে, একজন কৃতী ভারতসন্তান, সম্প্রতি পরলোকগত ডক্টর সুব্বা রাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেডারলি ল্যাবরেটরিতে উহা প্রথম কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। তিনি ঐ গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রণীয় যকৃৎ বা মেটে থেকে সম্প্রতি ভিটামিন বি$_{১২}$ পাওয়া গিয়াছে। ইহাও কঠিন রক্তাল্পতারোগে অতিশয় উপকারী। সুতরাং পাঁঠার বা অন্য জীবের মেটে মাঝে মাঝে খাওয়া যে নিতান্তই দরকার, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

ভিটামিন ডি

ভিটামিন ডি'র অভাবে ভুক্ত পদার্থের ক্যালসিয়ম ও ফস্‌ফরস্‌ শরীরে সহজে গৃহীত হয় না। রক্ত এবং পেশীকোষে উক্ত দুইটি পদার্থের সমতা রক্ষার্থেও ইহার প্রয়োজন। তোমরা জান যে, ক্যালসিয়ম এবং ফস্‌ফরস্‌ আমাদের হাড়ের ও দাঁতের প্রধান উপাদান, সুতরাং ভিটামিন ডি'র অভাবে হাড় ও দাঁতের সুগঠন হয় না। ভিটামিন ডি'র অভাবে ছেলেদের 'রিকেট' নামে রোগ জন্মে। হাত-পা সরু সরু হওয়া, পাঁজরার

হাড়গুলি উঁচু ও বুক নীচু হওয়া, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাওয়া এবং অঙ্গবিকৃতি রিকেট রোগের প্রধান লক্ষণ। ক্যারিজ নামে দাঁতের ব্যারামও ইহার অভাবে হইয়া থাকে। রিকেটী শিশু নিউমোনিয়াতেও শীঘ্র আক্রান্ত হয়।

ভিটামিন ডি তেলে-দ্রব পদার্থ। মাখন, মাছের যকৃৎ তেল ও ডিম এই তিনটি খাদ্যদ্রব্যেই উহা সচরাচর থাকে। স্টেরল জাতীয় (কোলেস্টেরল, আরগোস্টেরল) তৈলাক্ত পদার্থগুলিও সূর্যকিরণে ভিটামিন ডি-তে রূপান্তরিত হয়। আমাদের শরীরে স্টেরল থাকে, তাহা রৌদ্রে ভিটামিন ডি-তে রূপান্তরিত হইয়া শরীরের কাজে লাগে। এই জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতপ্রধান দেশের চেয়ে রিকেট রোগ কম। ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাবে, বিশেষতঃ পর্দানশীন মেয়েদের মধ্যে এই ব্যারাম বেশী দেখা যায়। রৌদ্রে-চরা গাভীর দুধে ডি ভিটামিন বেশী দেখা যায়। সমুদ্রতীরের বা পাহাড়ের বিমল রৌদ্রে আলট্রাভায়লেট রশ্মি বেশী থাকে। সহরে ধূলিধূমের মধ্যে যে অল্প রৌদ্র পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ রশ্মি পর্যাপ্ত থাকে না। আমাদের দেশে ছোট ছেলেমেয়েকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখাতে তাহাদের শরীরে ঐ ভিটামিন তৈরি হওয়ার ফলে শিশুদের উপকার হয়। আরগোস্টেরল হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম ভিটামিনকে ক্যালসিফেরল বলে। ইহাকে কেহ কেহ ভিটামিন ডি$_২$ও বলিয়া থাকেন। কোলেস্টেরল-জাত এই ভিটামিনকে ডি$_৩$ বলে। তবে উভয়ের ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া তোমাদের শুধু ভিটামিন ডি নাম জানিলেই চলিবে। অতি অল্প মাত্রায় ভিটামিন

ডি আমাদের দরকার হয়। ইহার অত্যধিক ব্যবহার ক্ষতি-কারক। তবে ভরসার কথা এই যে, আমাদের সচরাচর লব্ধ খাদ্যে ইহা যে পরিমাণে থাকে, তাহাতে মাত্রাধিক্য হইবার কোনও ভয় নাই। এই ভিটামিন রান্না বা ভাজাতে নষ্ট হয় না। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে ডি-ভিটামিন-সংযুক্ত ঔষধ ডাক্তারের দোকানে পাওয়া যায়। খাদ্যে এই ভিটামিন বেশী না থাকিলে আশঙ্কাজনক ক্ষেত্রে প্রসূতি ও শিশুদের ইহা ব্যবহার করা ভাল। আমাদের দেশী মাছের যকৃতের তেলেও ভিটামিন ডি আছে। কডলিভার ভিটামিন এ ও ডি সংযুক্ত ভাল জিনিস। হ্যালিবাট মাছের তেল আরও ভাল।

আমাদের বেশীর ভাগ ছেলেরাই যে এই ভিটামিন পায় না, তাহা নিম্নের উদাহরণেই বুঝা যাইবে। একটি শিশুর অন্ততঃ-পক্ষে দৈনিক যতটা ভিটামিন ডি দরকার, সওয়া সের ভাল দুধে তাহার অর্ধেক মাত্র পাওয়া যায়। দশটা ডিমে যতটা ভিটামিন ডি থাকে, একটি শিশুর বা বয়স্ক লোকের দৈনিক ততটা দরকার। নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা যে, রৌদ্রের ক্রিয়ায় অনেকটা ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের মধ্যেই তৈরি হয়। তবে তেল বা মাখনজাতীয় খাদ্য কম খাইলে অর্থাৎ শরীরে স্টেরলের অংশ বিশেষ না থাকিলে রৌদ্রে কি করিবে?

শিশুদের সর্বাঙ্গসুন্দর গঠনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিমল রৌদ্রে খেলাধূলার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য। তারপর যেসব খাদ্যের কথা বলা হইল, সেগুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রাণীজ স্নেহপদার্থ, মাখন বা

দুধ, মাছের তেল ও হাঁস-মুরগির ডিম নিয়মিত খাইলে এবং শিশুদের রৌদ্রে চলাফেরা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করিলে ডি-ভিটামিনের জন্য ভাবিবার দরকার করে না।

ভিটামিন ই

ইহার সম্পূর্ণ অভাবে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব জন্মে। শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার জন্যও ইহা আবশ্যক।

গমে, তেলে ও লেটুস শাকে ইহা বেশী পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ ও কড়াইশুঁটিতেও উহা যথেষ্ট থাকে। সুতরাং উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবার আবশ্যক করে না।

ভিটামিন কে (K)—এই ভিটামিনও তৈলে-দ্রব শ্রেণীর অন্তর্গত। মাখন ও তৈলজাতীয় খাদ্যে এবং শাকসব্‌জীর মধ্যে ইহা থাকে। ইহার অভাবে দাঁত খারাপ হয় এবং রক্তের স্পন্দন-ক্ষমতা হ্রাস পায়।

আমরা দেখিলাম যে, আমাদের প্রচলিত খাদ্য-সামগ্রীতেই ভিটামিনগুলি পাওয়া যায়, তবে ডাক্তারের দোকানের বিশুদ্ধ ভিটামিন বা ভিটামিনঘটিত ঔষধের প্রয়োজন কি?

ভিটামিনের বেশী অভাব হইলে খাদ্যস্থ ভিটামিনে বকেয়া শোধরাইয়া জমার ঘরে কিছু দাঁড়ায় না, ফলে ভিটামিনের অভাবজনিত ব্যাধি আক্রমণ করে। এ অবস্থায় ঘনীভূত বা বিশুদ্ধ ভিটামিন খাইতে হয়। তারপর কোনও কোনও

পীড়ায় পরিপাকক্রিয়ার দৌর্বল্যবশতঃ ভুক্ত পদার্থের ভিটামিন শরীরের কাজে লাগিতে পারে না। এরূপ অবস্থাতেও বিশুদ্ধ ভিটামিন খাওয়া দরকার।

ভিটামিন-প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাড়তির বয়সে ছেলেমেয়েদের এবং মায়েদের ভিটামিনের চাহিদা অনেক বেশী। জ্বর ও অন্যান্য অসুখে, অস্ত্রোপচারের পর এবং সালফোন অ্যামাইড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার কালে ভিটামিন সি প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশুদ্ধ ভিটামিনের ব্যবহার স্বতই বাঞ্ছনীয় ও বিধেয়।

বাঙালীর খাদ্যে ভিটামিন

ভিটামিন এ—দুধ, মাখন, ডিম, প্রাণীর মেটে, খল্‌সে, পাবদা, পারসে, কই, ন্যাদস প্রভৃতি মাছ ; চাঁই, রুই, আড়, প্রভৃতি মাছের তেল ; আম, টম্যাটো প্রভৃতি ফল ; গাজর, বাঁধাকপি, পালং, নটে ও অন্যান্য কচি শাক।

ভিটামিন বি—ঢেঁকিছাঁটা চাউলের ভাত, আটার রুটি, যবের ছাতু, চিড়া, গুড়, মাছ-মাংস, বিশেষতঃ মেটে, ডিম, মুগ, মসুরি, মটর প্রভৃতি ডাল ; বাঁধাকপি, গোলআলু, টম্যাটো, পোস্ত, কাঁঠালের বীচি, শাখআলু, বেগুন প্রভৃতি।

ভিটামিন সি—কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবিলেবু,

আনারস, পেয়ারা, আম, জাম, শশা, ডাবের জল, বাঁধাকপি, টম্যাটো, লঙ্কা, পেঁয়াজ, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, বরবটি, কলা, পেঁপে, পালং, নটে প্রভৃতি শাক।

ভিটামিন ডি—দুধ (মাখন), ডিম ও প্রাণীর লিভার-তেল এই কয়টিমাত্র খাদ্য-সামগ্রীতে ভিটামিন ডি থাকে। অনেকের ধারণা, রৌদ্রে ডি ভিটামিন থাকে। ইহা সত্য নয়। তবে শরীরে রোদ (সূর্যের আলট্রাভায়লেট রশ্মি) লাগিলে চামড়ার নীচে যে স্টেরলজাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, সেগুলি ভিটামিন ডি-তে পরিবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য, এই স্টেরলজাতীয় পদার্থ সাধারণ স্নেহপদার্থের সহিত থাকে। মাখন ও ডিমে ইহা দেখা যায়।

ভিটামিন ই—চাউল, আটা, শাকসবজী, বিশেষতঃ লেটুস শাকে ইহা বেশী থাকে।

এই স্থানে জানিয়া রাখা ভাল যে, দুধে ভিটামিন এ ও ডি ভিন্ন অন্য ভিটামিন অতি সামান্যই থাকে। শিশুদের ভিটামিন সি খুব দরকার। শিশুদিগকে কমলালেবু ও টম্যাটোর রস বা ডাবের জল খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা এই কারণে বেশী। ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে পাকা টম্যাটোর দাম প্রায় আপেলের দামের সমান। আমরা এখনও টম্যাটোর কদর তত বুঝি নাই। শীতকালে ছেলেমেয়েদের প্রত্যহই ইহা খাওয়া উচিত।

সস্তায় ভিটামিন বি—চিড়া-ধোয়া জল, ডাল, শাঁখআলু প্রভৃতি।

ভিটামিন-প্রসঙ্গে চিড়া, দুধ, ডিম, টম্যাটো, আম, আনারস, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, পালং, নটে, পাকা লঙ্কা, পেঁয়াজ, পেঁয়াজ-কলি, বাঁধাকপি, শশা, ডাব প্রভৃতির কথা মনে রাখা উচিত।

আমরা ভিটামিন অধ্যায়ে দেখিলাম, বহু উপকারী ভিটামিনেরই উৎস হইতেছে প্রাণীর লিভার বা মেটে এবং ঈস্ট বা সুরাবীজ। সুতরাং শরীরে ভিটামিনের অভাবজনিত ব্যাধির আশঙ্কা হইলেই এগুলি খাওয়া দরকার। অবশ্য অন্যবিধ ভিটামিনের জন্য কচি শাক, টম্যাটো, লেবু প্রভৃতি ত আছেই।

খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে ভিটামিনগুলি অতি অল্প মাত্রায় থাকে; এত অল্প যে, উহা আমাদের ছটাক তোলা বা আউন্স গ্রেনে প্রকাশ করাও অসম্ভব। একারণ উহাদের জন্য আজ তোমাদিগকে নূতন হিসাবের সহিত পরিচয় করাইতে চাই। এই ওজন হইতেছে গ্র্যাম ও মিলিগ্র্যামে। আমরা সোজাসুজি গ্রাম ও মিলিগ্রাম বলিব।

১ পাউণ্ড—৪৫৩·৬ গ্রাম

১ তোলা—১১·৩৪ গ্রাম

১ হাজার গ্রামে প্রায় ১ সের হয়।

১ গ্রামের ১ হাজার ভাগের ১ ভাগকে ১ মিলিগ্রাম বলে।

(১০০০ মিলিগ্রাম = ১ গ্রাম)

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশুদ্ধ ভিটামিনের অনেক-গুলিই আজকাল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এগুলি কাহারা

খায় জান? অজ্ঞতা বা তাচ্ছিল্যবশতঃ যাহারা দিনের পর দিন প্রাকৃতিক খাদ্য-সামগ্রীর এই অমূল্য উপাদান হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত করে সেই সব হতভাগ্যেরা তখন ভিটামিনের অভাবজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং ডাক্তারের দোকানের বিশুদ্ধ ভিটামিন ভিন্ন আর তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। ভিটামিনগুলির দামের কথা শুনিলে তোমরা খুবই বিস্মিত হইবে। নিম্নে পরিচিত ভিটামিনগুলির মূল্য লিখিত হইল—

		১৯৩৯ সাল	১৯৪৭ সাল
বিশুদ্ধ ক্যারোটিন	১ তোলার মূল্য প্রায়	২০০ টাকা	৪০ টাকা
" ভিটামিন বি$_১$	" " "	৫০ "	১০ "
" রিবোফ্ল্যাভিন	" " "	৯০ "	১১ "
" নিকোটিনিক অ্যাসিড	" "	১ "	½ "
" ভিটামিন সি	" " "	৪ "	২ "
" " ডি	" " "	৫৫০ "	১৫০ "

১৯৪৯ সালেও ঐ ভিটামিনগুলির মূল্য ১৯৪৭ সালে যেরূপ ছিল প্রায় সেইরূপই আছে।

তোমরা শীঘ্রই খাদ্যদ্রব্যের ভিটামিনের তালিকায় দেখিতে পাইবে যে, আমাদের অতি সাধারণ শাকসব্‌জি, ফলমূল প্রভৃতিতে উল্লিখিত অনেক ভিটামিনই পাওয়া যায়। মূল্যবান এবং শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার জন্য অপরিহার্য প্রকৃতিদত্ত এই পদার্থগুলির প্রতি যাহাতে আমাদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকে, সেজন্য মূল্যের উল্লেখ করা হইল।

এক্ষণে ভিটামিন এ, বি$_{১}$ ও ডি'র এককের কথা বলিতেছি —এগুলি পরে ব্যবহার করিতে হইবে, সুতরাং আগেই জানিয়া রাখা ভাল :—

১ মিলিগ্রাম	বিশুদ্ধ	ভিটামিন	এ = ৩০০০	ইউনিট বা	একক
১ "	"	"	বি$_{১}$ = ৩৩৩	"	"
১ "	"	"	ডি = ৪০,০০০	ইউনিট	"

আশা করি এখন ভিটামিনের তালিকাগুলি তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

তালিকার সংখ্যাগুলি মুখস্থ করিবার দরকার নাই। ইহাতে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে কোন্ ভিটামিন কি পরিমাণে আছে তাহা জানিতে পারিবে, এবং ইহাতে তোমাদের খাদ্য নির্বাচনের সুবিধা হইবে।

ভিটামিনের পরিমাণ সুবিধামত স্থানবিশেষে একক ও মিলিগ্রামে দেওয়া হইল। যেগুলির পরে কিছু লিখিত হইল না, সেগুলিতে যে আদৌ ঐ ভিটামিন নাই, এমন নয় ; তবে উহার ভিটামিনের পরিমাণ নগণ্য অথবা এখনও উহা সঠিক নির্ণীত হয় নাই বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশের খাদ্যদ্রব্যের অনেকগুলিই এখনও অপরীক্ষিত আছে। বড় হইলে তোমাদের মধ্যেই কেহ কেহ সেগুলির পরীক্ষা করিয়া বাহির করিবে এবং তদ্দারা জনসাধারণ উপকৃত হইবে।

পরের পৃষ্ঠায় কতকগুলি পরিচিত খাদ্য-সামগ্রীর ১০০ গ্রামে (৯ তোলা) কোন্ ভিটামিন কতটা আছে, তাহা লিখিত হইল—

প্রাণীজ খাদ্য	ভিটামিন এ (ইউনিট)	ক্যারোটিন (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি১ (ইউনিট)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
দুধ	১৩৩-২২০	—	২৩	১-৪.৫
মাখন	২১৭৬-২৯৪৪	—	—	—
ঘি	১০০০-১৫০০	৩.৭	—	—
ডিমের শ্বেতাংশ		—	—	—
,, কুসুম	৮৮০০	—	১০০	.৩-১.৩
ছাগ মাংস	—	—	—	২৬
মুরগীর লিভার	৬০১৫০	—	—	২২
মেষ লিভার	২২২০০	—	১৫০	২৫
,, মাংস	—	—	৬০	—
রুই লিঃ তেল	৩৪৪০-৫২০০	—	১৮	৫৮.৪-১৬০
টেংরা	৬০০	—	—	—
ইলিশ	২৩০০	—	১০	১৬.৩-৪৮
খল্‌সে	—	—	৩.৩	—
কাৎলা	৩৪০০	—	—	১১.২-৪১.২
কড (লিভার তেল)	৭৩০০০	—	—	—
হ্যালিবাট (লিভার)	১৯২০০০০-৩৬০০০০০			—
,, মাছ	৬৬০-১৪১০	—	—	—

উদ্ভিজ্জ খাদ্য	ভিটামিন এ (ইউনিট)	ক্যারোটিন (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি১ (ইউনিট)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
নারিকেল	—	—	—	১·৮
ডাবের জল	—	—	—	৪
চীনা বাদাম	—	০·০৬৩	১০০-৩২০	—
খেজুর	—	০·৬	৩০	—
কিসমিস	—	—	৭৫	—
আম	—	১·৬-৭·৭	৩৩	১৩-১০৩
আমলকী	—	—	—	২৭·৬-৪৭
আনারস	—	০·০৬	২৫-৩৩	৩৫-৪০
আপেল	—	—	৪০	৪-৫
আঙুর	—	০·১৫	—	৩-৪
পেয়ারা	—	০·১	১২	২৫
কলা	—	০·১২৪	৩০-৬০	৪৭-১৫৬
কমলালেবু	—	০·৩-০·৪	৪০	১৮-৫২
লেবু (বাতাবি)	—	০·১২	৪·০	২৫-৭০
পেঁপে	২৫০০	—	৮	৪৩
তেঁতুল	—	০·০৮৬-০·১১	৫০	১৩
লিচু	—	—	১৪	২৫-৪৮
টম্যাটো	—	১৪-৩৫	৪০	১২·৯-১৩·৭
ঐ রস	—	—	—	৪০

উদ্ভিজ্জ খাদ্য	ভিটামিন এ (ইউনিট)	ক্যারোটিন (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি$_{১}$ (ইউনিট)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
টম্যাটো খোসা	—	২৬৫-৩৫৬	—	—
গাজর	৬৪৭৬	—	৬০	৬-২৪
গাজরশাক	—	—	—	৯৫
বাঁধাকপি	—	৩·১-৩·৯	৮০	২০-১০০
ফুলকপি	—	০·০৩৮	১১০	৫০-১০০
ঢেঁড়স	—	০·০৫৮	২৮	—
পটল	—	০·১৬-·৯৩	১০-১২	১৩-২৫
গোলআলু	—	০·০২৮-০·০৫৬	৩০-৬০	১১-২০
উচ্ছে	—	০·২১-০·৩৫	৪-২০	২২
কুমড়া	—	০·০৮৪	১০	৪-৫
লঙ্কা (কাঁচা)	—	০·২৮-০৯	—	১৯-৮১
„ পাকা	—	—	—	১৩৮-২২০
„ শুক্‌না	—	০·৫৭৬	—	৫১
পেঁয়াজ	—	০·০২৫	৪০	৮-১০
„ কলি	—	—	—	১০-১২
মূলা	—	০·০০৩	৬-৬০	২০
শাঁকআলু	—	—	৩৫	—
মানকচু	—	—	২০	—
পালংশাক	—	২·৬৩-৬·৫	২০-৭০	৬০-১২৪
মূলাশাক	—	৭-৮·৬	—	৪৩

উদ্ভিজ্জ খাদ্য	ভিটামিন এ (ইউনিট)	ক্যারোটিন (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি$_1$ (ইউনিট)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
ফুলকপির পাতা		৩.৩-৩.৯	—	১১৩-১৩৪
পান	—	৭.২-১২	—	৪.৮-৫.২
পুঁইশাক	—	৩.২-৩.৫	৪০	—
ধনেপাতা	—	১০-১২	—	২৮-১৩৫
মুগ	—	—	—	৪
” অঙ্কুর	—	—	—	১৬-৪০
ছোলা অঙ্কুর	—	—	—	১২-১৮
বরবটি অঙ্কুর	—	—	—	১৫-৩২
লেটুস শাক	—	১.৫-২.৪	৯০	৫-১০
সরিষা শাক	—	০.২৭	—	৮১
তিল	—	—	১৪০	—
রুটি (ব্রাউন)	—	—	৭৫	—
চাল (ঢেকিছাঁটা)	—	—	২০-৯০	—
” কুঁড়া	—	—	১০০	—

যদিও এতদিন জানা ছিল যে, ভিটামিনগুলি শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা বজায় রাখিবার পক্ষে খাদ্যের অপরিহার্য অত্যাবশ্যক উপাদান ; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে বিবিধ ব্যাধিতে ঔষধ হিসাবেও অনেক প্রকার ভিটামিনই অতিশয় কার্যকরী। ভিটামিন হইতে প্রস্তুত কয়েকটি ঔষধও আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে কোরামিনের নাম না শুনিয়াছে এমন লোক নাই বলিলেও চলে। ইহা বি ভিটামিনের অন্তর্গত নিকোটিনিক অ্যাসিড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াবর্ধক মূল্যবান ঔষধ।

কয়েকটি পরিচিত খাদ্যদ্রব্যের ১০০ গ্রামে (৯ তোলাতে)

নিকোটিনিক অ্যাসিড ও রিবোফ্লাভিন কতটা আছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইল—

দ্রব্য	নিকোটিনিক অ্যাসিড (মিলিগ্রাম)	রিবোফ্লাভিন (মিলিগ্রাম)
ব্রাউন রুটি	১·২	—
ঢেকিছাঁটা সিদ্ধ চাউল	২·৮-৪	—
কলের আতপ	১·৬-২·৪	—
চালের কুঁড়া	৮·৮	—
বাঁধাকপি	০·৩	০·০৫
ছোলা	৫·৩	—
চীনা বাদাম (কাঁচা)	১৩	—
কড়াই শুঁটি	১-১·৮	০·০৮
" অঙ্কুরিত	—	০·২৮
কাঁচা লঙ্কা	১·২	—
গোল আলু	১-২	০·০০৭৫-০·০১
টম্যাটো	০·৫	০·০৫-০·০৭৫
দুধ	১০	০·১
ডিমের কুসুম	১-৪	০·৫-·৮
ছাগ বা ভেড়ার মেটে	৩৯-৪৬	০·১-২·৪
খরগোসের মেটে	৭৮·৫	—
কলা	—	০·০৫
নাসপাতি	—	০·০২
কমলালেবু	—	০·০২৮

দ্রব্য	নিকোটিনিক অ্যাসিড (মিলিগ্রাম)	রিবোফ্লাভিন (মিলিগ্রাম)
আপেল	—	০·০০৪
গাজর	—	০·০২
পালং শাক	—	০·০৫৭
ছানার জল	—	০·০৪৫
মধু	—	০·১০৬

মধুতে অনেক প্রকার সহজপাচ্য শর্করা আছে। নানা প্রকার ভিটামিন থাকায় উহা উপাদেয় বস্তু। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহাদের উহা নিয়মিত সেবন করা কর্তব্য।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে রান্নার পরে ভিটামিন কিরূপ থাকে, তাহা লিখিত হইল—(১০০ গ্রাম দ্রব্য)

দ্রব্য	ভিটামিন এ (ইউনিট)	ভিটামিন বি$_১$, (ইউনিট)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
বাঁধাকপি	৯৬০	—	১১-১৬
ফুলকপি	—	৩০	৩১
গাজর	১৮৮০	১১	৩·১
কড়াই শুঁটি	১০৫০	১২০	১১-১৫
পালং শাক	১২২৩০	৬	৩০-৮৭
টম্যাটো	৪২৭৫	৩৩	১৪-২১

দ্রব্য	ভিটামিন এ (ইউনিট)	ভিটামিন বি, (ইউনিট)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
গোল আলু	—	৩০	১০
পেঁয়াজ	—	১	৩·১
শালগম	—	—	১৮-২৮
মাখন	১৫৩৬-২০৭৪	—	—
ঘি	১৪৩৪	—	—
পারসে মাছ	৮০০-৬৪০০	৩০	—
মুরগীর মাংস	—	৪০	—

ভিটামিনের আবিষ্কার যদিও বেশীদিনের নয়, তথাপি এগুলির উপকারিতার জন্য বিশুদ্ধ ভিটামিন তৈরির ব্যবসায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার ভিটামিন প্রস্তুত হইতেছে। আমি নিজে এরূপ বহু কারখানা দেখিয়া আসিয়াছি। রাসায়নিক শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হওয়ায় আমাদের দেশে এই শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। ভিটামিনের আমদানিতে আমাদের দেশের কি বিপুল অর্থ বিদেশে যাইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। তোমরা বড় হইয়া রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের দেশে ভিটামিন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভিটামিনের আবিষ্কার দ্বারা দেশের ও জগতের জনগণের প্রকৃত হিতসাধন করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভে ধন্য হইবে, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

লবণ পদার্থ

যদি তোমাদিগকে বলা হয় যে, আমরা প্রত্যহ অন্ততঃ আট-দশ প্রকারের লবণ ব্যবহার করি, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবে। কারণ তোমরা বরাবর একপ্রকার লবণই পাতে বা তরকারিতে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত।

লবণের একটি সাধারণ গুণ কি জান? উহা আগুনে ধরিলে পোড়ে না। হাতায় করিয়া খানিকটা লবণ উনুনের গন্‌গনে আগুনের উপরে ধরিলেই ইহা বুঝিবে। খানিকটা ভাল সাদা চিনি কিন্তু ঐ প্রকারে হাতায় করিয়া ধরিলে দেখিবে প্রথমে উহা গলিয়া যাইবে—পরে ধোঁয়া উঠিতে উঠিতে কালো হইয়া কিছুক্ষণ জ্বলিবার পরে হাতায় কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। গুড় ঐ ভাবে পোড়াইলে দেখিবে, শেষকালে হাতায় সাদা ছাই পড়িয়া থাকিবে। এই সাদা ছাই গুড়ের ভিতরের লবণ। কলার শুকনা বাসনা, শুষ্ক আমপাতা প্রভৃতি পুড়িলে সাদা ছাই পড়িয়া থাকে, তাহা হয়তো তোমরা দেখিয়াছ। ঐ ছাই এসব জিনিসের ভিতরের লবণ। তবে এই লবণের সবটাই আমরা পাতে যে লবণ খাই তাহা নহে। এখন তোমরা বুঝিতেছ, আমরা যে আট-দশ রকমের লবণ খাই তাহা কোথা হইতে আসে। শাক-সবজি, ফলমূল, তরিতরকারী, দুধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য হইতে আমরা এই সব লবণ পাই বলিয়া বাজার হইতে সেগুলি কিনিতে

হয় না। ভাত, ডিমের শ্বেতাংশ প্রভৃতিতে লবণ অতিশয় কম থাকে। তেল, ঘিতে আদৌ লবণ পদার্থ নাই।

পূর্বে বলিয়াছি, লবণ পদার্থ প্রধানতঃ গঠনমূলক। শরীরের কাঠামো লবণপদার্থেই গঠিত।

আমাদের সুপরিচিত লবণ বা সোডিয়ম ক্লোরাইড খাদ্যের সহিত আমরা যতটা পাই, তাহাতে আমাদের শরীরের চাহিদা মেটে না; কাজেই প্রত্যহ উহা পাতে বা ডাল-ব্যঞ্জনের সঙ্গে খাইতে হয়। প্রত্যহ বয়স্ক লোকের প্রায় দেড় তোলা লবণ প্রয়োজন। রক্তের জলীয় অংশের প্রধান উপাদান সোডিয়ম ক্লোরাইড। কলেরা রোগে রক্তের জলীয় অংশ নির্গত হইয়া যাওয়ায় 'স্যালাইন' বা লবণ জল ইনজেকশন দিবার কথা তোমরা শুনিয়া থাকিবে। সোডিয়ম ক্লোরাইড ছাড়া সোডিয়ম ধাতুর আরও কয়েক প্রকার লবণ শরীরের কাজে লাগে। অতিরিক্ত ঘামে শরীর হইতে অনেকটা লবণ বাহির হইয়া যায়; এজন্য যাহারা রৌদ্রে বা গরম জায়গায় বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের বেশী লবণ খাওয়া প্রয়োজন। টক ফল প্রভৃতির সহিত বেশী লবণ খাওয়া যায়—একারণ এরূপ ক্ষেত্রে টক বেশী খাওয়া উপকারী। অবশ্য তোমরা জান যে, শীতকালের চেয়ে গরম-কালেই টক খাইতে বেশী ইচ্ছা হয় এবং উহা খাইতেও খুব ভাল লাগে।

মাংসপেশী ও রক্তকণিকার মধ্যে পটাস লবণ থাকে। দুধ, শাকসব্‌জী, গোলআলু, ভাত, রুটি ও ডালে পটাস লবণ বেশী থাকে। যকৃৎ প্রভৃতি শরীরের অনেক প্রধান যন্ত্রেই পটাস

লবণের প্রাচুর্য দেখা যায়। বস্তুতঃ এই উপকারী লবণ সাধারণ খাদ্য-সামগ্রীতেই প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া ইহার জন্য ভাবিতে হয় না।

তোমরা সকলেই চুনের সহিত সুপরিচিত। এই চুন যে ধাতু হইতে জন্মে তাহাকে ক্যালসিয়ম বলে। আমাদের হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়ম ফস্‌ফেট নামক পদার্থ। মানবদেহে শতকরা ১$\frac{১}{২}$ অংশ ক্যালসিয়ম। শরীরের যত ক্যালসিয়ম থাকে, তাহার প্রায় শতকরা ৯৯ অংশেরও বেশী আমাদের হাড়েই থাকে—অবশিষ্ট ক্যালসিয়ম রক্তে ও নরম পেশীতে থাকে ; এজন্য বাড়তির বয়সে ক্যালসিয়ম খুব দরকার। আমাদের অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যের সহিতই ক্যালসিয়ম থাকে ; তবে সব খাদ্যদ্রব্যের ক্যালসিয়ম সমভাবে শরীরের কাজে লাগে না। খাদ্যের মধ্যে অকজ্যালিক অ্যাসিড নামক দ্রব্য বেশী থাকিলে ক্যালসিয়ম জলেদ্রব হইতে পারে না ; ফলে অনেকটা ক্যালসিয়ম শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ২ ছটাক মাতৃদুগ্ধে ৪০ মিঃ গ্রাম ক্যালসিয়ম থাকে এবং উহার বেশীর ভাগই শরীরে গৃহীত হয়। ২ ছটাক গোদুগ্ধে ১২০ মিঃ গ্রাম ক্যালসিয়ম থাকিলেও উহার ৩৬ মিঃ গ্রাঃ মাত্র শরীরে গৃহীত হয়। ভাতের মধ্যে ক্যালসিয়ম কম থাকিলেও উহাতে অকজ্যালিক অ্যাসিডের পরিমাণ কম বলিয়া ঐ ক্যালসিয়মের প্রায় সবটাই (৮৭%) শরীরে গৃহীত হয়। পালং শাকে ক্যালসিয়ম ও অকজ্যালিক অ্যাসিড উভয়ই বেশী থাকে, একারণ উহার ক্যালসিয়ম বেশী কাজে লাগে না।

শরীরে ক্যালসিয়ম বেশী পরিমাণে গৃহীত হইতে হইলে, তিনটি বিষয়ের দরকার হয়—

১। ক্ষুদ্রান্ত্রের অম্লভাব

২। খাদ্যে অপর কতকগুলি উপাদানের অস্তিত্ব

৩। ভিটামিন ডি'র প্রভাব।

প্রোটিন খাদ্য বেশী খাইলে এবং অতিভোজন বা অপাক না হইলে, ক্ষুদ্রান্ত্রে কিছু সময় অম্লভাব থাকাতে ক্যালসিয়ম সহজে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

অন্ত্রের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে বলিয়া সুগার অব মিল্ক বা দুগ্ধশর্করা ক্যালসিয়ম গ্রহণে সহায়তা করে। দই খাইলেও এই উপকার পাওয়া যায়; একারণ সামর্থ্যে কুলাইলে দই প্রায়শঃ খাওয়া দরকার। কমলালেবু খাইলেও ক্যালসিয়ম শরীরে বেশী গ্রহণোপযোগী হয়।

ভিটামিন ডি খাদ্যের ক্যালসিয়ম বেশী পরিমাণে শরীরের কাজে লাগাইতে পারে বলিয়া সুপরিচিত।

ক্যালসিয়ম ঘটিত লবণের অল্পতায় হাড় ও দাঁতের গঠন ঠিক মত হয় না হৃদযন্ত্রের আকুঞ্চন প্রসারণেও ক্যালসিয়মের প্রভাব লক্ষিত হয়। শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়ম অপরিহার্য।

দুধ, চিংড়ি ও রুইমাছ, বাদাম, ডাল, ডিমের কুসুম, ফুলকপি, সরিষাবীজ, ডাঁটা ও নটেশাক, পালংশাক ও অন্যান্য তরি-তরকারিতে ক্যালসিয়ম পাওয়া যায়। ছোট মাছ কাঁটাসমেত খাইলে অনেকটা ক্যালসিয়ম পাওয়া যায়। পানের সহিত যে

চুন ব্যবহৃত হয়, উহাও শরীরের কাজে লাগে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমাদের পরিচিত শাকের মধ্যে মিষ্টি কুমড়ার শাকের ক্যালসিয়ম শরীরের কাজে খুব বেশী লাগে বলিয়া ডক্টর কালীপদ বসু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আমাদের মত সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এ কথাটি মনে রাখা ও উহা কার্যতঃ পালন করা কর্তব্য। আমিষ খাদ্য বেশী খাইলে সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়মও বেশী দরকার। বয়স্ক লোকের খাদ্যে প্রত্যহ প্রায় আধ গ্রাম (০·৫৫ গ্রাম) ক্যালসিয়ম থাকা প্রয়োজন।

হাড় ও দাঁত ছাড়া মাংসপেশী, মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-গঠনে **ফস্‌ফরস্‌** একটি প্রধান উপাদান। দুধ, ছানা, ডিমের কুসুম, উচ্ছে, মানকচু, পটল, বাদাম, গোলআলু, পেঁয়াজ, ঢেঁড়স, গাজর, হিঞ্চে, সরিষা, পুঁই, পালং প্রভৃতি শাক, বিবিধ ডাল, কলা ও ডুমুরে ফস্‌ফরস্‌ যথেষ্ট থাকে। প্রত্যহ বয়স্ক লোকের পক্ষে ১ গ্রাম হইতে ১½ গ্রাম ফস্‌ফরস্‌ প্রয়োজন হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাল ও আটার ফস্‌ফরস্‌ অপেক্ষা তরিতরকারি ও শাকসব্‌জির ফস্‌ফরস্‌ শরীরের বেশী কাজে লাগে। অবশ্য দুধের ফস্‌ফরস্‌ শরীরের পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপকারী। ডাল প্রভৃতিতে ফাইটিন নামক পদার্থের সঙ্গে বেশী ফস্‌ফেট সংযুক্ত থাকে এবং উহা পরিপাক হয় না। একারণ ছোলা, মসুর প্রভৃতি ডাল ও আটা ময়দার ফস্‌ফরস্‌ শরীরের তত উপকারে আসে না।

লৌহ—রক্তকণিকার অতি প্রধান উপাদান। এই লৌহের

সাহায্যেই শ্বাসের সহিত গৃহীত বাতাসের অক্সিজেন গ্যাস সারা শরীরে সঞ্চরণ করিয়া মানুষের প্রাণ বাঁচাইতেছে। বয়স্ক মানুষের প্রত্যহ ১০-১২ মিঃগ্রাম লৌহ আবশ্যক। রক্তাল্পতা রোগে লৌহঘটিত ঔষধ খাইতে দেওয়া হয়। অনেক খাদ্যদ্রব্যেই লৌহ থাকে; তবে খাদ্যের সবটা লৌহই শরীরের কাজে লাগে না। ডিম, মাংস প্রভৃতির লৌহ শরীরে সহজে গৃহীত হয়। ক্রমনিম্নহার হিসাবে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে লৌহ পাওয়া যায়ঃ—

শুষ্ক ডাল	আটা
শাকসব্জি	মুরগির মাংস
শুষ্ক ফল (খেজুর কিসমিস প্রভৃতি)	কাঁচা মটরশুঁটি
বাদাম, চাউল, বাঁধাকপি, উচ্ছে, পটল, পান	গোলআলু
	গুড়

রক্ত প্রভৃতির সহিত লৌহ যে ভাবে যুক্ত থাকে, তাহা পরিপাক হইয়া শরীরের কাজে লাগিতে দেরী লাগে। অজৈব লৌহ—অর্থাৎ লোহার পাত্রাদি হইতে রান্নার সময় যাহা খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া যায় অথবা হিরাকস প্রভৃতি লৌহঘটিত লবণ বাঁধাকপি প্রভৃতি খাদ্যসংযোগে বেশী কার্যকরী হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। দুধে লৌহ অতি অল্প থাকে। শটির পালোতে খুব লৌহ আছে, সুজীতে তার চেয়ে কম, বার্লিতে আরও কম। সুতরাং শিশুদের দুধের সঙ্গে পালো ব্যবহার করা সঙ্গত। আমাদের রান্নার পাত্রাদি হইতে লৌহ

তরিতরকারির সহিত উদরস্থ হইয়া শরীরের লৌহের অভাব অনেকটা পূরণ করিয়া থাকে। এলুমিনিয়ম শরীরের কোনও উপকারে আসে না, বরং উহার সান্নিধ্যে খাদ্যের ফসফরস্ অনেকটা নষ্ট হয়। সুতরাং তোমরা দেখিতেছ, রান্নার পাত্রাদি লৌহের বা মাটির হওয়াই ভাল। এলুমিনিয়মের ব্যবহার যত না করা যায়, ততই স্বাস্থ্যসঙ্গত।

তাম্র—অত্যল্পমাত্রায় তাম্রঘটিত লবণ রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে অতিশয় প্রয়োজনীয়।

বাদাম, ডাল, আটা, কিসমিস, মুরগীর মাংস, মাছ, ডিম, কড়াইশুঁটি, গোলআলু ও টাটকা ফলমুলে উহা পাওয়া যায়। রক্তাল্পতা রোগে ইহার লবণ ব্যবহারে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ---শরীরের ভালরূপ বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য ইহা শরীরের পক্ষে আবশ্যক। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য শরীরে কাজে লাগাইতেও ইহার ক্ষমতা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মানকচু, পটল, উচ্ছে, চাল, দুধ প্রভৃতির মধ্যে ইহা পাওয়া যায়।

ম্যাগনেসিয়ম—হাড়ের গঠনে ও শরীরের অন্যান্য কার্যে ইহার প্রভাব আছে। শাকসব্জি ও তরিতরকারির মধ্যে ম্যাগনেসিয়ম যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আয়োডিন—এই পদার্থের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। মানুষের শরীরে ইহা অতিশয় অল্প পরিমাণে থাকে। অথচ ইহার উপকারিতা অসাধারণ। আমাদের থাইরয়েড নামক

গণ্ডের ইহা প্রধান উপাদান। এই গণ্ড সম্যক গঠিত না হইলে মানুষের বুদ্ধি খোলে না। সম্পূর্ণরূপে আয়োডিনের অভাব হইলে গলগণ্ড রোগ জন্মে। সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রদেশের শাকসবজি ও মাছের মধ্যে আয়োডিন থাকে, একারণ আমাদের খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতির ভয় কম। কডলিভার তেল বা অন্য সামুদ্রিক মাছের তেলেও আয়োডিন দেখা যায়।

পৃথিবীর যে সকল দেশ সমুদ্রতীরবর্তী এবং যেখানকার অধিবাসীরা মাছ ও দুধ পর্যাপ্ত খায় তাহাদের মধ্যেই বুদ্ধির প্রাখর্য লক্ষিত হয়। বাংলাদেশ, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহার সাক্ষ্য মেলে। দেশবিভাগের ফলে পূর্ববাংলার সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত, মাছ দুধের প্রাচুর্যে বঞ্চিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর আর সকল প্রকার দুর্গতির সঙ্গে তাহার মানসিক অবনতিও যে অবশ্যম্ভাবী সেই নিদারুণ সত্য খাদ্যে আয়োডিন প্রসঙ্গে (প্রোটিনও বটে!) বুঝিতে পারিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি।

শিশুকে স্তন্য দিবার সময় ও গর্ভাবস্থায় মেয়েদের ক্যালসিয়ম, লৌহ প্রভৃতি লবণ পদার্থ অনেক বেশী প্রয়োজন। বাড়তির বয়সে ছেলেমেয়েদেরও অনুরূপ বেশী পরিমাণে লবণ পদার্থ আবশ্যক—একথা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

লবণ পদার্থ প্রসঙ্গে একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা আছে। আমরা যে সকল খাদ্য খাই, তাহার কতকগুলি পরিপাকান্তে অম্ল ও অপর কতকগুলি ক্ষার উৎপন্ন করে। শরীরের সুস্থতার জন্য

অম্ল ও ক্ষারের সমতা প্রয়োজন, বরং অতি সামান্য ক্ষারভাবই দরকার। সুতরাং খাদ্য নির্ব্বাচন এরূপভাবে করা উচিত যাহাতে ঐ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে। লেবু, টম্যাটো, আম প্রভৃতি টক ফলও পরিপাকের পর ক্ষার জন্মায়, ইহা শুনিলে তোমরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবে। পরিচিত কয়েকটি খাদ্য-সামগ্রীর কোন্‌গুলি ক্ষার ও কোন্‌গুলি অম্ল উৎপাদক, তাহার তালিকা দেওয়া হইল—

(ক্রমনিম্নহারে লিখিত)

ক্ষার উৎপাদক	অম্ল উৎপাদক
ডাল, কিসমিস, বিট,	ডিমের কুসুম, মাছ, মাংস
গাজর, শাক, গোলআলু,	ময়দা, ভাত,
কমলালেবু, কলা, লেবু,	ডিমের শ্বেতাংশ
ফুলকপি, বাঁধাকপি, আপেল;	
ও দুধ	

এই কারণে মাংস ও ডিমের সহিত গোলআলু, মাছের সহিত আলু, বেগুন, পটল, কাঁচকলা প্রভৃতি তরিতরকারির সংযোগ বাঞ্ছনীয়। আহারের সময় শাক, ডাল, ঘণ্ট, টক এবং শেষে কলা, আম বা সময়োপযোগী পাকা ফল খাওয়া সঙ্গত।

কলা প্রভৃতি ফল যখন কাঁচা থাকে তখন উহাতে থাকে শ্বেতসার। পাকিবার সময় উহার অধিকাংশই শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তন ঘটায় ফলের ভিতরের এক-প্রকার পদার্থ যাহাকে এনজাইম বা কীণ্ব বলা হয়। মল্টের নাম অনেকে জানেন। শ্বেতসারকে শর্করাতে পরিণত করিবার

কীণ্ব উহাতে থাকে। শ্বেতসার যুক্ত পদার্থ—ভাত রুটি প্রভৃতি সহজে পরিপাক করিবার উদ্দেশ্যে অনেকে আহারান্তে মল্ট খাইয়া থাকেন। কলা, কাঁটাল প্রভৃতি পাকাফলেও অনুরূপ পদার্থ থাকে বলিয়া আহারকালে ঐ সব ফল খাইলে পরিপাকের সহায়তা হয়। ফলের অপর বহুবিধ উপাদানের উপকারিতা ত আছেই।

সাহেবেরা মাংস, ডিম প্রভৃতি যথেষ্ট খাইলেও সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল প্রত্যহই খাইয়া থাকে। উহাদের আংশিক অনুকরণে মাছ, মাংস, রুটি পর্যাপ্ত খাইয়া, ফল শাকসবজি প্রভৃতি না খাইলে শরীরের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করা হয়। রেস্তোঁরাতে যাঁহারা খান, তাঁহাদের বিশেষভাবে ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

শাক যে কেবল গরীবের খাদ্যই নয় পরন্ত উহা মানুষের খাদ্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অঙ্গ তাহা ভুলিলে রক্তাল্পতা, রক্তের চাপ প্রভৃতি জটিল ব্যাধির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ইহা ভাবিয়া ইতরভদ্র, ধনীদরিদ্র সকলেরই প্রত্যহ শাক খাওয়া অবশ্য কর্তব্য।

জল

তোমাদের সামনে দুই গেলাস জল ধরিলাম। দেখিতেছ, চেহারা দেখিয়া কোনও তফাৎ মনে হইতেছে না, কিন্তু যখন মুখে দিলে, তখন বুঝিতেছ, একটিতে সরবৎ, অপরটিতে শুধু জল রহিয়াছে। অন্য একটি গেলাসে খানিকটা ভাল সাদা লবণ

লইয়া জল দিয়া ঝাঁকাইলে দেখিবে, সে গেলাসের জলেরও চেহারার কোন তফাৎ নাই। ইহা হইতে দেখিতেছ, জলে অন্য জিনিস থাকিলেও তাহার চেহারা ধরা যায় না। এ ক্ষেত্রে লবণ ও চিনির স্বাদ আছে বলিয়া মুখে দিয়া বুঝিতে পারিলে, কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি জলে গুলিলে জলের বিশুদ্ধতা বুঝা বড় শক্ত। তোমরা শুনিয়া থাকিবে, কোন কোনও কুয়ার জলে ডাল সিদ্ধ হয় না বা সাবানে কাপড় ফরসা হয় না। এই জলে ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম ঘটিত লবণ থাকে বলিয়া জলের এই ভাবান্তর হয়। লবণ পদার্থ ভিন্ন অনেক সময় ব্যাধির বীজও জলে থাকে। তোমরা জান—কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের বীজ সাধারণতঃ জলের সাহায্যেই ছড়াইয়া পড়ে। অবশ্য এগুলিও পরীক্ষা করিলে ধরা যায়, তবে জলের চেহারা দেখিয়া বা খাইয়া কিছুই টের পাওয়া যায় না।

জলই আমাদের জীবন। সুতরাং বিশুদ্ধ জল পান করা কর্তব্য। সন্দেহজনক স্থলে ডাবের জল খাওয়া ভাল; অথবা জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়া দরকার। জলের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহচালিত বিশেষভাবে নির্মিত দুটি রূপার দণ্ড—(আরগোলাইট) কিছু সময় রাখিলে সে জলের ব্যাধি-বীজাণু নষ্ট হয়।

রৌপ্যপাত্রে খাদ্যপানীয় রাখার উপকারিতাও সম্ভবতঃ এই কারণেই। অবশ্য সব চেয়ে সহজ উপায় হইতেছে জল ফুটাইয়া পান করা। জল খাওয়া কেন দরকার তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; খাদ্য পরিপাক হইয়া তাহার সারাংশ

জলের সহিতই সরবতের মত অবস্থায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। আবার খাদ্য-সার শরীরের কাজে লাগিবার পর ইউরিয়া, লবণ, গন্ধক ও ফসফরাসের অজৈব যৌগিক পদার্থ, ইউরিক অ্যাসিড, হিপপিউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি যে সব অব্যবহার্য বা দূষিত পদার্থ রক্তস্রোতে জমে, সেগুলিও জলের সঙ্গেই বাহিত হইয়া মূত্র বা ঘামের সহিত শরীর হইতে নির্গত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ জল আমাদের দরকার। আমরা সচরাচর যে জল খাই, তাহা ছাড়া খাদ্যের সঙ্গেও অনেকটা জল আমরা পাইয়া থাকি। ডালও ঝোলের সঙ্গে বেশ খানিকটা জল পাওয়া যায়। ভাতের মধ্যেও প্রচুর জল থাকে। খাঁটি দুধে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ জল। যে পাঁউরুটি অত শক্ত দেখ, তাহারও শতকরা ৪০ ভাগই জল। আঙুর, আপেল, কমলালেবু, কলা, আম প্রভৃতির মধ্যে ত প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই জল থাকে।

অনেকে আহার-কালে জল খাইতে নিষেধ করেন; ইহা কিন্তু ঠিক নয়। আহারের প্রারম্ভে একটু জল, ডালের জল, বা সুপ খাইলে খাওয়ার সময় হিক্কা ওঠে না। তারপর পিপাসা ও প্রয়োজন মত অল্প অল্প করিয়া জল খাওয়া ভাল।

পাকস্থলীতে জারক রস পাতলা হওয়ায় হজমের অসুবিধা করিবে বলিয়া যে ধারণা আছে তাহা বিজ্ঞানসম্মত নয়। আহারকালে উপযুক্ত পরিমাণে জলপান করিলে জারক-রসগুলি বরং বেশী নিঃসৃত হয় এবং উহাদের হজমকারক

শক্তিও বাড়ে। তদ্ভিন্ন খাদ্যের সারাংশ অধিক পরিমাণে রক্তস্রোতে শোষিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণ জল পানে অন্ত্রের জীবাণুর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি কমে এবং অন্ত্রের মধ্যে পচনক্রিয়াও অনেকটা হ্রাস পায়।

আহারের পরবর্তী ৩।৪ ঘণ্টায় কয়েকবার জল পান করা ভাল। রাত্রে শুইবার পুর্বে মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া বেশ খানিকটা জল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। সচরাচর একজন বয়স্কলোকের দৈনিক প্রায় ৩ সের জল পান করা প্রয়োজন। অবশ্য ইহার ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। পরিশ্রম, গরম প্রভৃতির উপরেই ইহা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে।

পরিপাক যন্ত্র ও উহার ক্রিয়া

খাদ্যের উপাদানগুলির প্রকৃতি এবং সেগুলি ক্রমশঃ কিরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে শরীরের কাজে লাগে—সে বিষয়ের মোটামুটি আভাস দিয়াছি। এখন পরিপাক যন্ত্রের গঠন প্রণালী এবং তাহার কোন্ কোন্ জারক রসের বা এনজাইমের সাহায্যে খাদ্যের কিরূপ রূপান্তর ঘটে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

পরিপাক যন্ত্র

প্রথমে পরিপাক যন্ত্রের একটি চিত্র দেওয়া হইল। সহজ ভাবে ইহাকে একটি লম্বা ফাঁপা নলের মত মনে করিতে পার।

ইহার কোনো স্থান সরু, কোনো স্থান বা মোটা—আর মাঝে মাঝে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রণালী আসিয়া ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। একটি নদী বহিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন উপনদী আসিয়া উহাতে মেশে। তারপর গঙ্গা নদীর যেমন বিভিন্ন অংশে গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি নাম আছে, আমাদের এই পরিপাক যন্ত্ররূপ নালীটিরও বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। অবশ্য ইহার বিভিন্ন অংশের কাজও পৃথক পৃথক।

মুখগহ্বরকে পরিপাক যন্ত্রের প্রথম অংশ ধরিতে পার। খাদ্য মুখে পড়িলে মুখগহ্বরের পারটইড, সাবম্যাকসিলারী প্রভৃতি গণ্ড থেকে লালারস ঝরিতে থাকে। লালারসে শক্ত খাদ্য সরস হওয়ায় গলাধঃকরণের সুবিধা হয়। তা ছাড়া ইহার টায়ালিন নামক এনজাইম বা জারক পদার্থ শ্বেতসার খাদ্যকে আংশিক শর্করাতে পরিণত করে। কাজেই ভালভাবে চিবাইয়া না খাইলে লালারস খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশিতে না পারায় পরিপাকের অসুবিধা ঘটে।

ছবিতে দেখিতেছ, মুখ গহ্বর হইতে একটি সরু নল পাকস্থলীতে গিয়া পড়িয়াছে। এটির নাম অন্ননালী। বয়স্ক লোকের এই নালীর দৈর্ঘ্য নয় ইঞ্চি।

পাকস্থলী চামড়ার মশকের মত একটি থলি। শূন্য অবস্থায় উহার দেয়াল গুলি প্রায় গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে—খাদ্য পিণ্ড পাকস্থলীতে পড়িলে উহা ফুলিয়া ওঠে। পাকস্থলীতে খাদ্য পৌঁছিলেই উহার দেয়াল হইতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামক

অম্ল এবং পেপসিন নামক এনজাইম ঝরিতে থাকে। পেপসিনের ক্রিয়ায় আমিষ খাদ্যের পরিপাক শুরু হয়। খাদ্য পড়িলে পাকস্থলী আলোড়িত হইতে থাকে, ফলে ভুক্ত পদার্থ পাকস্থলীর রসের সঙ্গে ভালভাবে মিশিবার সুযোগ পায়। স্নেহ পদার্থ এবং ইক্ষু শর্করাও পাকস্থলীতে আংশিক রূপান্তরিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। খাদ্যের সুঘ্রাণে পাকস্থলীর রস বেশী পরিমাণে ঝরে। অনিচ্ছা, রাগ বা শোকের প্রাবল্যের সময় এই রস সম্যক ঝরে না, ফলে এইরূপ অবস্থায় আহার করিলে বদ হজমের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

তোমরা সুয়েজ খালের নাম শুনিয়াছ। উহা ভূমধ্য সাগরের সহিত লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে। খালটি আমাদের গঙ্গার অর্ধেকের ও কম প্রশস্ত, লম্বায় প্রায় একশত মাইল—মাঝে মাঝে উহা বড় বড় সুদৃশ্য হ্রদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ খাল আসিয়া হ্রদে পড়িয়াছে এবং হ্রদের অপর প্রান্ত হইতে আবার খাল আরম্ভ হইয়াছে। ভূমধ্য-সাগর হইতে খালে প্রবেশের পথে, মিশরের, পোর্ট সৈয়দ বন্দরের কূলে, বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জনিয়র ফারডিনাণ্ড ডি, লেসেপসের প্রকাণ্ড দণ্ডায়মান মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। এই ইঞ্জিনিয়রের তত্ত্বাবধানে খাল কাটা হয় এবং ১৮৬৮ সাল হইতে উহার ভিতর দিয়া জাহাজ চলাচল আরম্ভ করে। আমাদের পাকস্থলী যেন ঐ সুয়েজ খালের একটি হ্রদ।

পাকস্থলীর অপর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২০ ফুট লম্বা ভাঁজে ভাঁজে সাজানো নলাকার অংশ ক্ষুদ্রান্ত্র নামে

পরিচিত। ইহাকেই আমরা সচরাচর নাড়িভুঁড়ি বলিয়া থাকি। ক্ষুদ্রান্ত্রের আরম্ভের প্রথম ১২ অঙ্গুলি বা ১১ ইঞ্চি পরিমিত অপেক্ষাকৃত মোটা অংশটিকে বলা হয় ডিওডেনাম বা গ্রহণী। পাকস্থলী হইতে আংশিক জীর্ণ ও কাদার মত ভুক্ত পদার্থ যখন ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে, তখন পিত্তকোষ হইতে পিত্তরস ও ক্লোমযন্ত্র বা প্যানক্রিয়েজ হইতে ক্লোমরস আসিয়া তাহার সঙ্গে মেশে। ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেও একপ্রকার জারক রস ঝরিয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজ প্রধানতঃ দুই প্রকার। ভুক্ত পদার্থকে বিবিধ জারক রস সাহায্যে জীর্ণ করা ও সেই জীর্ণ অংশগুলিকে ভিলাই নামক লসীকাবাহী নালী ও অসংখ্য নালী প্রণালীর ভিতর দিয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। ফলতঃ ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেছে পরিপাক যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও প্রধান অংশ। এখানে কত রকমের যে ক্রিয়া চলে তাহার পুরোপুরি খবর এখনও মানুষ জানিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পিত্তরসের ক্রিয়াতে স্নেহ পদার্থ দুধের মত (ইমালসন) অবস্থা পায় এবং তাহাতে পরে উহার উপর এনজাইমের ক্রিয়া ভাল ভাবে চলিতে পারে। ক্লোমরসে ট্রিপসিন, এমিলোপসিন এবং লিপেজ নামক তিনটি বিভিন্ন এনজাইম্ বা জারক পদার্থ থাকে।

তোমার পূর্বেই দেখিয়াছ পাকস্থলীতে (প্রোটিন খাদ্য) আংশিক জীর্ণ হয়। এখন ক্লোমরসের ট্রিপসিনের ক্রিয়াতে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়—অর্থাৎ প্রোটিন রূপান্তরিত হইয়া অ্যামিনো অ্যাসিড জন্মে। কার্বোহাইড্রেটও মুখে দিবার সঙ্গে সঙ্গেই লালার ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের

এমিলোপসিনের সাহায্যে ইহা শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়। লিপেজ স্নেহ পদার্থকে ভাঙিয়া বা পরিপাক করিয়া জন্মায় গ্লিসারিণ ও চর্বিজ অম্ল। তোমরা বড় হইলে এই সব পদার্থ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিবে।

একটি কথা মনে রাখিবে যে, খাদ্যের সঙ্গে স্নেহ পদার্থ না থাকিলে ক্লোমরস সম্যক নিঃসৃত হয় না। অথচ ক্লোমরস নি:সরণের উপর খাদ্য পরিপাক যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। তৈল, ঘি খাওয়ায় অপর একটি উপকারিতার বিষয় এখন তোমরা বুঝিতে পারিলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রধান এনজাইমগুলির উল্লেখ করা হইল। এ ছাড়া আরও কয়েকটি এনজাইম আছে। সকলের সম্মিলিত ক্রিয়ায় ভুক্ত পদার্থ আমাদের শরীরের গ্রহণোপযোগী হইয়া ওঠে।

ভিটামিন বি$_1$ ক্ষুদ্রান্ত্রের আলোড়ন বা আকুঞ্চন প্রসারণে সহায়তা করে বলিয়া উহা পরোক্ষ ভাবে পরিপাকের সহায়তা করে।

আমরা গিনিপিগের পেট উন্মোচন করিয়া দেখিয়াছি—উহার নাড়ি ভুঁড়ি বা ক্ষুদ্রান্ত্র সর্বদা আকুঞ্চন প্রসারণ করে। প্রাণিটির মৃত্যুর পরেও অনেকক্ষণ এইরূপ নড়াচড়া চলিতে থাকে। কুণ্ডলী পাকানো সাপ নড়াচড়া করিলে যেরূপ দেখায় এও দেখিতে অনেকটা সেইরূপ। আমাদের পেটের মধ্যেও (ক্ষুদ্রান্ত্র তলপেটে থাকে) প্রতিনিয়তই এইরূপ আলোড়ন চলিতেছে অথচ আমরা ইহার কিছুই খবর রাখি না। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা, হিমালয়ের উচ্চতা,

লক্ষ যোজন দূরের তারকার জন্ম ও গঠন প্রণালী আমরা মুখস্থ করি, কিন্তু আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখি না। ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা নয় কি?

তোমরা হয়ত জান যে, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধির বীজ এই ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেই প্রথম এবং প্রধানতঃ বাসা বাঁধে ও সেখানে খাদ্যসারে পুষ্ট হইয়া বংশ বৃদ্ধিপূর্ব্বক বিস্তার লাভ করে। খাদ্যে স্নেহপদার্থ কম থাকিলে ক্ষুদ্রান্ত্রের যে অবস্থা হয় তাহা আমাশয় প্রভৃতি রোগের বীজের অনুকূল বলিয়া অনেকের ধারণা।

'গজভুক্ত কপিত্থবৎ'—কথাটি তোমরা শুনিয়াছ কিনা জানি না। প্রবাদ, হাতীকে কয়েতৎবেল খাওয়াইলে উহা তাহার মলের সহিত আস্তই বাহির হয়, অথচ কয়েৎবেলের ভিতরের শাঁস প্রভৃতি আর কিছুই দেখা যায় না। অর্থাৎ বাহিরের শক্ত আবরণটুকু বাদে হাতী আর সবই নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলে। আমাদের খাদ্যেরও অধিকাংশ সার পদার্থই এই ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেই পরিপাক হইয়া শরীরে শোষিত হইয়া থাকে। অকেজো অংশ, সামান্য কিছু অশোষিত পদার্থ এবং অনেকটা জল এখন যে অপেক্ষাকৃত মোটা নালি দিয়া মলদ্বার অভিমুখে রওনা হয় সেই অংশকে বৃহদন্ত্র বা সরলান্ত্র বলে। এটি পাঁচ ফুট লম্বা। আহারের ৯ হইতে ২৩ ঘণ্টার মধ্যে উল্লিখিত পদার্থগুলি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। বৃহদন্ত্রে নূতন কোনও এনজাইম দেখা যায় না। খাদ্যসারের যে সামান্য অংশ

ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষন ক্রিয়া এড়াইয়া যায় তাহা এবং প্রায় সমুদয় জল বৃহদন্ত্রে শোষিত হয় এবং মল ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করিতে থাকে। বৃহদন্ত্রে উক্ত পদার্থগুলি সাধারণতঃ একদিন বা বেশী সময় থাকিয়া অবশেষে আঁশ জাতীয় অকেজো অংশ ও অশোষিত খাদ্যকণা, কালজীরা, লঙ্কা, টম্যাটো বা পেয়ারার বীজ প্রভৃতি মলরূপে নির্গত হয়। মলের মধ্যে অনেক প্রকার বীজাণুও লক্ষিত হয়। আহারের অনিয়মে, খাদ্য ভালরূপে চর্বিত না হওয়ায় বা পরিপাক যন্ত্রের দৌর্বল্যে অনেক সময় ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে প্রোটিন প্রভৃতির অশোষিত অংশ বেশী মাত্রায় বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করিলে তাহা পচিয়া অনেক প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন করে। এরূপ অবস্থায় খোস পাঁচড়া প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। তদ্ভিন্ন মাথাধরা, আলস্য বোধ, দুর্বলতা, মানসিক চাঞ্চল্য ও ইহার জন্য হইতে দেখা যায়। অকাল বার্ধক্যেরও ইহা অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

এই কারণেই প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে, উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা আবশ্যক। চর্বণের উপর যখন এতটা নির্ভর করিতেছে তখন দাঁত পরিষ্কার করা ও দাঁতের যত্ন লইয়া তাহাকে বেশী দিন কার্যকরী অবস্থায় রাখা যে নিতান্তই আবশ্যক তাহা এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ। বৃহদন্ত্রের পচন ক্রিয়ার কুফল হইতে তোমরা অনুমান করিতে পার যে, বদ হজম কত অপকারী। পূর্বোক্ত

কারণ ব্যতীত অতিভোজনেও বদহজম হইতে পারে; সুতরাং অতিভোজন সর্বতোভাবে বর্জনীয়। প্রধান আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া দীর্ঘপথ হাঁটা বা শ্রমসাধ্য কাজ করা অবিধেয়। এ বিষয়ে একটি মূল্যবান্ সংস্কৃত শ্লোক আছে। নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া হইল—

"ভোজনান্তে আরাম করিয়া উপবেশন করিলে আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং ভোজনান্তে দ্রুতগমন করিলে শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।"

এই অধ্যায় হইতে পরিপাক যন্ত্রের চেহারা ও তাহার বিবিধ ক্রিয়া সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি ধারণা জন্মিল। ইহার বিভিন্ন অংশে কত জটিল যন্ত্র নিরলস ভাবে দিবারাত্র খাটিয়া খাদ্যের সারাংশ আমাদের রক্তস্রোতে উপহার দিয়া আমাদের জীবনী শক্তি যোগাইতেছে—ইহা অপরিসীম বিস্ময়কর ব্যাপার বটে! এই ব্যাপারে আমাদের হাতে যে সামান্য ভার ন্যস্ত আছে—উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করিয়া পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ ও উত্তমরূপে চর্বণ করা—এই সামান্য কর্তব্যটুকুও যদি আমরা পালন না করি তবে আমরা যে ঘোরতর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব ও হাতে হাতে তাহার শাস্তি ভোগ করিব তাহাতে কি কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে?

তোমরা কিন্তু আজীবন সাধ্যমত এই কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

———

আমাদের প্রচলিত খাদ্য-পদ্ধতির সমালোচনা

(১) আমাদের দেশে আহারের প্রাক্কালে কিছু জলপান করার বা গণ্ডূষ করার যে প্রথা আছে, উহা বিজ্ঞানসম্মত। উহাতে পাকস্থলী সরস হওয়ায় জারক রস সহজে নির্গত হয় এবং উহাতে আহারকালে হিক্কা হয় না। সাহেবদের সুপ খাওয়া এই পর্যায়ের অন্তর্গত। ভাতের ফেন বা ডালের জলের সঙ্গে টম্যাটো, ফুলকপি বা অন্য তরকারির কুচি দিয়া সস্তায় সুপ তৈরি করা যাইতে পারে। উহার প্রচলন আমাদের পক্ষে অবশ্য করণীয় বলিয়াই মনে হয়।

(২) খাওয়ার প্রথম দিকে যে তেতো বা সুক্ত খাওয়ার রেওয়াজ আছে, উহা পাকস্থলীর জারক রস নিঃস্রাবে সহায়তা করে। পাতে ঘি খাওয়ার নিয়মও ভাল। ভাল ঘি'র সুগন্ধে জারক রস বেশী নিঃসৃত হয়। তারপর ঘি সংপৃক্ত হওয়ায় চর্বিত পদার্থগুলির মধ্যে লালারসের ক্রিয়া বেশীক্ষণ চলিতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, লালারসের ক্রিয়াতে ভাত রুটি প্রভৃতির কার্বোহাইড্রেট আংশিক পরিপাক হয়। পাকস্থলীর অম্লরসে ক্ষার নষ্ট হইলে লালারসের ক্রিয়াও বন্ধ হয়। ঘি সংযুক্ত থাকাতে অম্লরস সহজে লালা-সংপৃক্ত

কার্বোহাইড্রেটের সহিত মিশিতে পারে না, ফলে লালারসের ক্রিয়া ভালভাবে সম্পন্ন হইবার অবসর পায়।

(৩) মুগ, মটর, মসুর প্রভৃতি ডালের সহিত প্রোটিন বাদে ভিটামিন বি-ও আমরা অনেকটা পাইয়া থাকি; সুতরাং কলছাঁটা চাউলের ভাতে ভিটামিন বি-র কম্‌তি থাকিলেও ডালে উহা অনেকটা পূরণ হইয়া থাকে।

(৪) বাঙালী পরিবারে প্রায় প্রত্যহ পালং, নটে, কলমি, হিঞ্চে, মূলা, পুঁই, লাউ, পেঁয়াজ, মোচা, ইঁচড়, থোড়, ডুমুর, আলু, বেগুন, ঝিঙা, ডাঁটা, কাঁঠালের বিচি, কুমড়া প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের শাক ও তরিতরকারিতে ভিটামিন ছাড়া প্রয়োজনীয় লবণ পদার্থও অনেকটা পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলির ব্যবহার অনাবশ্যক ও সেকেলে ভাবিয়া বাদ দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। একথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে,

শাক গরীবের খাদ্য নয়, শাক মানুষের অপরিহার্য খাদ্য!

উল্লিখিত তরিতরকারি ও শাকের আঁশ জাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণ পরিপাক না হওয়ায় উহা কোষ্ঠ পরিষ্কারের সাহায্য করে। কলছাঁটা চালের ভাত, ময়দার রুটি, মাছ, মাংস প্রভৃতি আহারে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে, কিন্তু সঙ্গে ঘণ্টতরকারি, থোড়, শাক প্রভৃতি থাকিলে অথবা আহারের পরে আম বা কলা প্রভৃতি ফল খাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিতে পারে না। অনেকে কোষ্ঠকাঠিন্যে ঘন ঘন ক্যাষ্টর অয়েল বা তরল প্যারাফিনের জোলাপ লইয়া থাকেন। এই পদার্থগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের অনেকটা স্নেহপদার্থ এবং তৎসহ ভিটামিন

এ প্রভৃতি ধুইয়া লইয়া যায়; কাজেই ইহাতে শরীরের বড় ক্ষতি হয়। খাদ্যে শাক সবজীর আঁশ জাতীয় অংশ দ্বারা 'রাফেজ' বাড়াইয়া মল সরল করাই সবচেয়ে ভাল নিয়ম। অবশ্য অত্যন্ত বেশী শাক খাইলে অনেক উপকারী খাদ্যকণাও ঐ শাকের আঁশজাতীয় পদার্থের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

(৫) মাছের ঝাল অর্থাৎ প্রচুর সরিষা ও লঙ্কা যোগে মুখরোচক ভাবে মাছ রান্না খুব ভাল নয়। মাছের ঝোলে সময়োপযোগী টাটকা তরিতরকারি—বেগুন, পটল, আলু প্রভৃতি যোগে রান্না করিয়া খাদ্যের ক্ষার এবং অম্লের সমতা রক্ষা করা বিধেয়। হাঁসের ডিম মুরগীর ডিমের চেয়ে কম পুষ্টিকর নয়। ডিম বেশী ভাজিয়া রান্না করিয়া কতকগুলি মসলার পরিমাণ বাড়ানো ও ভাজিয়া দুষ্পাচ্য করা উচিত নয়। ওমলেট্ ও অল্পসিদ্ধ ডিম পেঁয়াজ-লঙ্কা সহ মাখিয়া ডালের সহিত খাইলে বেশী উপকার হয়। ডিম কাঁচা খাওয়া ভাল নয়; তাহাতে ডিমের শ্বেতাংশ হজম হয় না।

(৬) নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে ২।৩ দিন অল্প মসলাযোগে পেঁপে, আলু বা টম্যাটো প্রভৃতি সহ রাঁধিয়া মাংস খাওয়া বিধেয়। মাসে এক বা দুই দিন আকণ্ঠ মাংস খাইয়া মাংস ভক্ষণের দোষ গাহিয়া বেড়ান যুক্তিযুক্ত নয়।

অনেকে বলিতে পারেন, সাহেবেরা ত মাছ মাংসে কোনও তরকারি দেয় না—কিন্তু তাহারা আহার কালে স্যালাড, সিদ্ধ কড়াই শুঁটি, গোল আলু, বাঁধা বা ফুলকপি এবং আনারস,,

খেজুর আপেল, কলা, প্রভৃতি প্রত্যহই যথেষ্ট পরিমাণে খাইয়া থাকে। আমরা অবস্থাবৈগুণ্যে এবং স্কুল কলেজ বা আফিসের তাড়ায় শুধু ডালভাত বা শুধু ঝোলভাত খাইতে বাধ্য হই। 'পঞ্চ ব্যঞ্জন' আর আমাদের কয় জনের ভাগ্যে জোটে! এই জন্য মাছমাংসে তরকারি সংযোগের কথা ভুলিলে আমাদের চলিবে না।

(৭) গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ টক খাওয়া দরকার। শীতকালে কয়েৎবেল ও টম্যাটোর, গ্রীষ্মে আম, আমড়া ও করমচার; বর্ষায় আমড়া ও কচি তেঁতুলের এবং যে কোনও ঋতুতেই তেঁতুলের টক রান্না করিয়া খাওয়া যায়। পাতি লেবু বা টক আহারের শেষের দিকে খাওয়া ভাল,—কারণ লেবুর অম্লতায় ক্ষারধর্মী লালারসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। টক ডালও মাছ প্রভৃতির পরে খাওয়া সঙ্গত।

(৮) আমাদের দৈনন্দিন আহার্যে ঘি মাখন প্রায়ই থাকে না, সুতরাং ডাল ডালনায় নারিকেল দেওয়া ভাল। নারিকেলের তৈলপদার্থ বিশেষ উপকারী। ধনে পাতায় ভিটামিন এ ও সি খুব আছে, সুতরাং রুচি অনুসারে উহার প্রচলনও মন্দ নয়।

(৯) আহারের শেষের দিকে দুধকলা, দুধআম বা অভাবে শুধু কলা খাওয়া উপকারী। আমাদের খাদ্যপদ্ধতি যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত এবং সাহেবদের চেয়ে আদৌ নিন্দনীয় নয় তাহা পল্লীর সচ্ছল লোকের আহারের শেষে দুধ-কলা, দুধ-আম প্রভৃতি খাওয়া হইতেই বুঝা যায়।

দধি উত্তম খাদ্য, উহার প্রচলনও গরমের দেশে যথেষ্টই ছিল। কলা বিশেষ উপকারী এবং উহা বারমাসই পাওয়া যায়। পাকা ফলের অন্যান্য উপকারিতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সাহেবরা মিষ্টি ও পাকা ফল খাইয়া আহার শেষ করে। মধুরেণ সমাপয়েৎ—কথাটি জানা থাকিলেও আমরা শহরে উহা পালন করিতে পারি না। সামর্থ্য অনুসারে উহা পালনের চেষ্টা করা কর্তব্য। মাঝে মাঝে দই খাওয়া ভাল। উহা পরিপাক যন্ত্রের সুস্থতা বিধান করে। ঘোল উপকারী। বৃদ্ধ বয়সে দধি ও ঘোল নিয়মিত খাইলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাবের জলও অতিশয় উপকারী পানীয়।

(১০) মধ্যে মধ্যে খিচুড়ী খাওয়া ভাল। উহাতে ফেন ফেলিয়া দেওয়া হয় না বলিয়া ভাতের বি-ভিটামিন সবটাই পাওয়া যায়। তারপর উহার সহিত সাধারণতঃ তেল বা ঘি বেশী খাওয়া হয়; কাজেই খিচুড়ী বলকারক খাদ্য।

অসুখের পরে কেহ কেহ আটার রুটি প্রথমে পথ্য দেন। রুটির চেয়ে পুরাতন সরু সিদ্ধ চালের ভাত অনেক সহজপাচ্য; সুতরাং প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন আবশ্যক।

(১১) ঘি মাখন খুবই ভাল, কিন্তু যাঁহারা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করেন অথচ গরীব, তাঁহাদের পক্ষে ভঁয়সা ঘি, বাদাম, সরিষা, তিল তেল বা টাটকা নারিকেল তেলের যে কোনো একটি খাইতেই হইবে। যথাযথ সতর্কতার

সহিত প্রস্তুত ঘন-তেলের (হাইড্রোজিনেটেড তেলের) প্রচলনও অসঙ্গত নয় বলিয়াই সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ প্রায় একই প্রণালীতে প্রস্তুত মার্গারিন ইউরোপীয় দেশসমূহে বহুকাল হইতেই বিনা আপত্তিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য আমাদের দেশে উহা বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় কিনা তৎপ্রতি জাতীয় সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

(১২) ভাল রান্নার সহিত পরিপাক ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পুষ্টিকর খাদ্যও যদি মুখরোচক না হয়, তবে অনিচ্ছার সহিত খাইলে উহা ভাল হজম হয় না। গুড়ের ঘ্রাণে যেমন দলে দলে পিপীলিকা গর্ত হইতে ছুটিয়া হাজির হয়, সেইরূপ খাদ্যের সুগন্ধ ও সুস্বাদে খাদ্য পরিপাককারী জারকরস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং তাহাতে পরিপাক ক্রিয়া সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

অনেকে সাহেবী খানার প্রশংসায় শতমুখ। সত্য বটে, সাধারণতঃ আর্থিক সঙ্গতির জন্য খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান তাঁহারা বেশী খান কিন্তু রান্নার জন্য তাঁহাদের প্রশংসা খুব বেশী প্রাপ্য নয়। শীতের দেশে সাধারণতঃ ক্ষুধা বেশী হয়—তারপর ঠাণ্ডার দরুন এবং মাছি প্রভৃতি না থাকায় খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বীজাণু প্রবেশের সম্ভাবনা সেদেশে কম। কাজেই মসলা প্রভৃতির তেমন ব্যবস্থা না করিলেও তাঁহাদের ক্ষতি হয় না। পাচক এবং হোটেল-ওয়ালাদের দায়িত্বজ্ঞানও ওদেশে খুব বেশী। আমাদের গরম দেশে ঝালমসলা চাটনি প্রভৃতির ব্যবহারে

জারক রস বেশী ক্ষরিত হয়, ফলে পরিপাকের সুবিধা জন্মে। তদ্ভিন্ন হলুদ ও অন্যান্য মসলাতে ব্যাধিবীজ ধ্বংস করে বলিয়া আমাদের দেশে ওগুলির প্রচলন হইয়াছে। তবে মাত্রাধিক্য অবশ্যই দূষণীয়।

শীত প্রধান পাশ্চাত্ত্য দেশে মসলা জন্মে না। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষ থেকে উহা ইউরোপে চালান যাইত। এই ব্যবসায় ছিল অতিশয় লাভজনক। ফলতঃ মসলার লোভেই পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি সমুদ্রপথে ভারতে আসে ও মসলার সন্ধানেই ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ তাহারা আবিষ্কার করে। লবঙ্গ, দারুচিনি, গোল মরিচ পভৃতির সারপদার্থ বাহির করিয়া সেগুলির প্রকৃতি নির্ণয়ে রসায়ন শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তোমরা বড় হইলে এ সব কথা সবিশেষ জানিতে পারিবে।

(১৩) খাদ্য একেঘেয়ে না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। একঘেয়ে হইলে অরুচি আসে এবং তাহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে। শুধু এক বা দুই রকম খাদ্যের চেয়ে পাঁচ-মিশালী খাদ্য বেশী সহজে হজম হয়। উদাহরণ স্বরূপ, শুধু দুধ পরিপাক হইতে সময় লাগে, কিন্তু দুধের সঙ্গে চিড়ামুড়ি, খই বা রুটি খাইলে উহা সহজে পরিপাক হয়। কারণ, শুধু দুধ পাকস্থলীর অম্লে এক তাল ছানা হইয়া পড়ে; পরন্তু উহা খই বা রুটি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত থাকিলে স্পঞ্জের মত সচ্ছিদ্র ছানা হয়, ফলে ঐ ছানার উপর জারক রসের ক্রিয়া সহজে হইতে পারে। পাকস্থলীতে অম্লের

অম্লতা হেতু বয়স্কলোকে শুধু পেটে পাতলা দুধ খাইলে উহা তাড়াতাড়ি অন্ত্রের মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে। পাকস্থলীতে অম্লের ক্রিয়ায় ছানা না বাঁধিলে অন্ত্রের মধ্যে ঐ দুধের ভাল পরিপাক হয় না। রেনেট নামক পদার্থের ক্রিয়ায় দুধ সহজে ছানাতে পরিণত হয়। শিশুদের পাকস্থলীতে ঐ রেনেট প্রচুর পরিমাণে থাকে বলিয়া শিশুরা অনেকটা তরল দুধ সহজে পরিপাক করিতে পারে। যাঁহারা পাতলা দুধ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা দুধ ঘন করিয়া বা ছানা কাটিয়া খাইলে উপকার পাইবেন। ছানার জলে দুগ্ধশর্করা, বি-ভিটামিন ও জলেদ্রব প্রোটিন থাকে, একারণ ছানার জল উত্তম পানীয়; উহা ফেলিয়া দেওয়া কদাচ উচিত নয়।

আমাদের একটি ধারণা আছে যে, মোষের দুধ গরুর দুধের চেয়ে দুষ্পাচ্য। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কলিকাতা প্রভৃতি শহরে অনেকে আর্থিক সামর্থ্য থাকিতেও খাঁটি গোদুগ্ধ দুর্লভ বলিয়া দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, মহিষ দুগ্ধে গোদুগ্ধের চেয়ে মাখনের পরিমাণ বেশী থাকিলেও (৭.৩%: ৪.৯%) উভয়ের মধ্যে অন্যান্য উপাদানের বিশেষ পার্থক্য নাই এবং মাখনের পরিমাণ বেশী থাকা সত্ত্বেও মহিষদুগ্ধ গোদুগ্ধের মতই সমভাবে পরিপাক হয়।

পাশ্চাত্ত্যের সব দেশেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গোপালন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় ধনীদরিদ্র সকলেই সেখানে প্রত্যহ দুধ খাইতে পায়। সুইজারল্যাণ্ডের মত ধনী দেশের শহরেও টাকায় আড়াই সের খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

আমাদের দেশেও ঐ সকল দেশের অনুকরণে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, কারণ শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা বিধানে দুগ্ধপান অপরিহার্য।

(১৪) বেশী ঠাণ্ডা বা বেশী গরম জিনিস খাওয়া ভাল নয়; কারণ জারক রসগুলি শরীরের তাপেই ভাল ক্রিয়া করে। অধিক উত্তাপ বা শৈত্যে সেগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ায় ভুক্ত পদার্থ ভাল পরিপাক হয় না। অতিশয় শোকে, রাগের মাথায় বা বেশী পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না করিয়া আহার করা অনুচিত, উহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে।

(১৫) ডিম-মাংসের সঙ্গে দুধ খাইলে বিরুদ্ধ-ভোজনের দোষ ঘটে বলিয়া একটি প্রচলিত কথা আছে। ইহার পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত কারণ বিশেষ নাই। ডিম বা মাংস অল্প পরিমাণে খাইলে তাহার পরে দুধ খাওয়াতে ক্ষতি করে না। দুধে লৌহ ও ভিটামিন বি অতি অল্প থাকে অথচ ডিমে ঐ দুই পদার্থ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে ; একারণ ডিম ও দুধ একসঙ্গে খাওয়া বরং বাঞ্ছনীয়। পরন্তু, যদি আকণ্ঠ মাংস খাওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহার সঙ্গে দুধ খাওয়া সঙ্গত নয় ; কারণ একসঙ্গে বহুপরিমাণে প্রোটিন খাওয়াতে উহার পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

(১৬) প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আহার করা কর্তব্য। কারণ জারক রসগুলির নির্দিষ্ট সময়ে নিঃসৃত হওয়া অনেকটা যেন অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়। শরীরবিদ্‌গণ প্রাণীর উপর পরীক্ষায় ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। ইয়োরোপবাসিগণ

এবিষয়ে অতিশয় মনোযোগী। রেল-ষ্টিমারে ভ্রমণকালেও এঁরা যথাসময়ে আহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা রেলের রেস্তোরাঁতে খাইতে অসমর্থ তাঁহারা বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় খাবার সঙ্গে করিয়া লইয়া নিয়মিত সময়ে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আহার করেন। আমি ঐ সব দেশে বেড়াইবার সময় অনেকদিন ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। খাইবার সময় ধীরে ধীরে ও যথাসম্ভব-উত্তমরূপে চিবাইয়া খাওয়া উচিত। ইহাতে ভুক্ত পদার্থগুলি জারকরসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ফলে পরিপাক ক্রিয়া সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। আহারের ঠিক পরেই ঘুমান অনুচিত। আহারের অব্যবহিত পরে দৌড়ান বা পরিশ্রমসাধ্য কার্য করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে।

বালক-বালিকাদের খাদ্য

পূর্বেই বলিয়াছি, বাড়তির বয়সে খাদ্যের গঠনমূলক উপাদান—প্রোটিন ও লবণ পদার্থ বেশী দরকার। আবার এইগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য ভিটামিনেরও অধিক প্রয়োজন। সুতরাং এ বয়সে দুধ, ডিম, মাছ-মাংস প্রভৃতি প্রোটিন-প্রধান ভাল খাদ্যের বেশী দরকার। ১৩ বৎসরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের বয়স্কলোকের সমান খাদ্যই লাগে। খেলাধূলা প্রভৃতির সময় তাহাদের বয়স্কদের অপেক্ষাও

বেশী খাদ্যের প্রয়োজন। ৬ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের বয়স্কলোকের খাদ্যের শতকরা ৭০ অংশ দরকার।

শাঁখআলু, কলা, টম্যাটো, কমলালেবু, বাতাবি লেবু, পেয়ারা, আম প্রভৃতি ফলমূলও এই বয়সে বেশী খাওয়া দরকার। আখের রসে শর্করা বাদে বিভিন্ন প্রকারের বি-ভিটামিন ও সি যথেষ্ট থাকে; সুতরাং যখনই পাওয়া যায় বাড়িতে আখ আনিয়া ছেলেমেয়েদের খাইতে দেওয়া উচিত। দুধ ও ডিমে ভিটামিন এ, ডি ও তৎসঙ্গে ক্যালসিয়ম এবং ফস্‌ফরস্‌ঘটিত লবণ থাকে; এ কারণ শরীর গঠনের সময়ে এগুলি খাওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

স্কুলের ছেলেরা টিফিনের সময় যাহাতে উপযুক্ত খাদ্য খায়, তাহার প্রতি অভিভাবক ও শিক্ষকগণের মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। পাড়াগাঁয়ে অনেক স্কুলেই ছেলেমেয়েদের জল খাবারের বড় একটা ব্যবস্থা থাকে না। অনেকেই দুপুরে প্রায় কিছুই খায় না। বহু ছেলে ৪।৫ মাইল দূর হইতে সকালে ভাতে-সিদ্ধ ভাত খাইয়া স্কুলে আসে; এদিকে বাড়ি ফিরিতে তাহাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। লেখকও ছিলেন ইহাদেরই একজন। এই দীর্ঘ সময় অভুক্ত থাকাতে তাহাদের শরীরের প্রভূত ক্ষতি হয়। তারপর স্কুলে ছেলেদের ড্রিল করিতে হয়। স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা না থাকিলে ছেলেদের ড্রিল করান তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রায় সব স্কুলেই টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। নরওয়ে দেশে

'ওস্‌লো টিফিন' নামে জলযোগের ব্যবস্থায় ছেলেদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছেলেকে দেওয়া হয়—আধসের দুধ, আটার রুটি ও মাখন, একটি কাঁচা গাজর ও আপেল অথবা একটি কমলা লেবু ও কিছু পনির।

আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় বলিয়া দুই-একটি স্কুল-বোর্ডিং-এ ছেলেদের ডিম, মাংস বা মাছ খাইতে দেওয়া হয় না। পরিবর্তে দুধ বা ছানা ঐসব ছেলেদের আবশ্যক অনুযায়ী প্রত্যহ দেওয়া হয় কিনা, তৎপ্রতি অভিভাবকগণের এবং সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আমাদের পল্লী বিদ্যালয়ের গরীব ছেলেরা স্কুলে আসিবার সময় যদি বাড়ি হইতে রুটি-গুড় বা চিড়া-গুড় ও নারিকেল লইয়া আসে, অথবা শশা চিড়া লবণ আনে, তবে উহা টিফিনের সময় খাইতে পারে। অবশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের তত্ত্বাবধানে যদি সময়োপযোগী ফলমূল—আম শশা কলা আনারস শাঁখআলু এবং তাহার সঙ্গে চিড়া ও আখের গুড়, মাঝে মাঝে আটার রুটি ও ডিম সিদ্ধ এবং গোল আলু বা রাঙাআলু সিদ্ধ টিফিনের সময় দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে ছেলেদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-গণের এদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ছেলেদের ওজন লইবার জন্য স্কুলে একটি করিয়া ওজন লইবার যন্ত্র রাখা দরকার এবং ছেলেদের মাঝে মাঝে (মাসে অন্ততঃ ১বার) ওজন লইয়া উহা খাতায় লিখিয়া রাখা প্রয়োজন। ওজনের কমতি দেখিলে

ছেলেরা নিজেরাই খাদ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হইয়া উঠিবে।

ছেলেমেয়েদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত—

রূপান্তরিত খাদ্যের নামই দেহ—খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের উপর জীবনের সকল সাফল্য নির্ভর করে।

প্রত্যহ খাদ্যের কোন্ উপাদান কতটা দরকার

তোমরা সহজেই বুঝিতে পার, প্রত্যহ কোন্ জিনিস কত খাইবে তাহার তালিকা করিয়া দেওয়া শক্ত। একই ব্যক্তি বিভিন্নরূপ পরিশ্রমের পর এবং বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য খাইয়া থাকে। কতটা খাইতে হইবে তাহা সাধারণতঃ আমাদের ক্ষুধাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দৈনিক আহার্যে যাহাতে শরীরের আবশ্যক উপাদানগুলির সংস্থান থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আজকাল খাদ্যের শক্তিপ্রদ উপাদানের অপেক্ষা রক্ষী খাদ্য অর্থাৎ প্রোটিন, লবণপদার্থ ও ভিটামিনের উপর বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়। ক্ষুধানিবৃত্তি শুধু ডালভাতেও হইতে পারে, আবার ডালভাতের সঙ্গে অন্য উপকরণের সমবায়েও হইতে পারে। মাছ, মাংস, ডিম ও ছানা জৈব প্রোটিনের এবং মাখন, ঘি, ও মাছের তেল জৈব স্নেহ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। খাদ্যের উৎকর্ষ উহার জৈব প্রোটিন

ও জৈব স্নেহ পদার্থের উপরেই মুখ্যতঃ নির্ভর করে—আর উপকারী ভিটামিনগুলিও তো প্রায় উহাদেরই নিত্যসহচর।

বয়স্ক লোকের দৈনিক আবশ্যক খাদ্য-উপাদান—

	নিতান্ত আবশ্যক	বাঞ্ছনীয়
স্নেহপদার্থ·········প্রাণীজ	৩ তোলা	৯ তোলা
উদ্ভিজ্জ	২ তোলা	২ তোলা
প্রোটিন············প্রাণীজ	৩ তোলা	৪½ তোলা
উদ্ভিজ্জ	২ তোলা	৪½ তোলা
কার্বোহাইড্রেট ··· ···	১০ ছটাক	৯ ছটাক
ভিটামিন 'এ' ··· ···	১ মিলিগ্রাম	৩ মিলিগ্রাম
ক্যারোটিন ··· ···	২ "	৫ "
ভিটামিন ডি ··· ···	২০০ ইউনিট	৪০০ ইউনিট
ভিটামিন বি১ ··· ···	১ মিলিগ্রাম	৩ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি ··· ···	২৫ "	৭৫ "
রিবোফ্ল্যাভিন ··· ···	+ ?	২ "
নিকোটিনিক অ্যাসিড ···	+ ?	১০ "

উল্লিখিত খাদ্যোপাদানগুলি দৈনন্দিন আহার্যে সন্নিবেশের জন্য বিলাতে সম্প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক নিম্নলিখিত খাদ্যবরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে :—

দুধ ··· ··· ··· ···	ছয় ছটাক
১টি ডিম বা মাছ ··· ···	দুই ছটাক
মাংস (চর্বিহীন) ··· ···	দুই ছটাক

পনির	... ...	এক ছটাক
মাখন বা মার্গারিন	... ...	দুই ছটাক
আটার রুটি	... ...	নয় ছটাক
চিনি	... .	এক ”
গোল আলু	... ...	ছয় ”
স্যালাড	... ...	খানিকটা
রান্না করা শাকসব্জী	....	দুই ছটাক
কমলালেবু	...	১টি অথবা
আপেল	...	২টি
পাকা কলা	...	১টি

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাহার পরিবর্তন অবশ্যই হইবে। কারণ, শ্রমের পরিমাণ এবং শরীরের ওজনের উপর খাদ্যের চাহিদা নির্ভর করে। পরে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হইবে। তবে খাদ্যনির্বাচনে যাহাতে ঐ দফাগুলি মানিয়া চলা হয় তৎপ্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য।

আমরা নানা কারণে দারিদ্র্যের এত নিম্নতম স্তরে পড়িয়া আছি যে, তালিকায় নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া যাহা ধরা হইয়াছে তাহার সংস্থান করাও আমাদের খুব অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। যাঁহাদের এরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিবার সঙ্গতি আছে তাঁহারা হয়ত বলিবেন, “এরূপ আমিষ-বহুল খাদ্য কি বাঙালীরা হজম করতে পারবে?” কিন্তু অনেকেই জানেন ইহার চেয়ে পরিমাণে অধিক এবং অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য সেদিন পর্যন্তও

বাংলার মধ্যবিত্ত ও জোতদার-জমিদার শ্রেণীর লোকে অনায়াসে হজম করিতেন এবং তাঁহারা শক্তিও রাখিতেন অসাধারণ। আমিষ-নিরামিষ আহার প্রসঙ্গে ভারত-গৌরব স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থলে বলিয়াছেন—"যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারে দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ কি ? রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।...সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দুই কুড়ি কই মাছ কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, একশ বছর বাঁচত।"

খ্যাতনামা খাদ্যবিদ্ ম্যাককেও (McCay) ঠিক এই প্রকার অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন—"মাংসপেশীর সম্যক গঠনে, শরীরের সাধারণ সৌকর্যসাধনে, সহিষ্ণুতাবিকাশে, ব্যাধি প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাইতে এবং সর্বোপরি কোনও জাতি বা শ্রেণীকে শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতায় অগ্রগণ্য করিতে প্রাণীজ আমিষ পদার্থের প্রভাব অসামান্য।"

বলা বাহুল্য, দুগ্ধের আমিষপদার্থ অর্থাৎ ছানা অতি উচ্চ স্তরের প্রাণীজ আমিষ পদার্থের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে দুধ বা ছানা এবং তৎসঙ্গে সহজপাচ্য, সুসিদ্ধ ডাল আবশ্যক মত খাইলে শরীরের আমিষপদার্থের চাহিদা ভালভাবেই মিটিতে পারে। উপযুক্ত আহারের সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমও যে সমভাবে প্রয়োজনীয় সেকথা ভুলিলে চলিবে না। ছেলেদের ব্যায়াম, খেলাধূলা এবং অপর যাঁহারা বসিয়া কাজ

৬

করেন তাঁহাদের সকালে বিকালে বেড়ান বা বাগানের কাজ করা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য করণীয়।

ডিম, দুধ ও লিভারের উপাদান

উপাদান	১টি ডিম	ছয় ছটাক দুধ	১ ছটাক লিভার
প্রোটিন	৬·৮ গ্রাম	৯·৯ গ্রাম	১১·৬ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	—	১৪ "	১ "
স্নেহপদার্থ	৫·৫ "	১০·৩ "	২.৬ "
ক্যালসিয়ম	৩০ মিলিগ্রাম	৩৭৫ মিলিগ্রাম	৬ মিলিগ্রাম
ফস্‌ফরস্‌	১১০ "	২৮০ "	২০৮ "
লৌহ	১·৬ "	০·১ "	৫ "
ভিটামিন 'এ' / ক্যারোটিন	২০০-৮০০ ইউ.	২০০-১০০০ ইউ.	১৪০০০ ইউ.
ভিটামিন বি$_১$	৪ ইউনিট	৪৫ ইউনিট	৫০ ইউনিট
রিবোফ্ল্যাভিন	১০০-৩৫০ মিঃগ্রাম	২১০-৬৮০ মিঃগ্রাম	১৪০০ মিঃ
ভিটামিন সি	—	৬ মিলিগ্রাম	২২ "
ভিটামিন ডি	১০০-৫০ ইউনিট	২ ইউনিট	৫ ইউনিট

তোমরা 'দৈনিক আবশ্যক উপাদান' তালিকাটি এই তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝিবে অপরাপর আহার্যের সহিত এ গুলির অন্ততঃ কোনও একটির যোগাড় থাকিলে দৈনিক আবশ্যক খাদ্য-উপাদানের সংস্থান অনেকটা সহজেই

হইতে পারে। এগুলি অতিশয় ঘনীভূত পুষ্টিকর পদার্থ এবং ইহাদের মধ্যে শরীরের গঠনমূলক উপাদান ও ভিটামিনের সুন্দর সমাবেশ আছে।

অবশ্য ঋতুবিশেষে প্রাণীর খাদ্যের পার্থক্যবশতঃ উহাদের ভিটামিনের পরিমাণ কমবেশী হইয়া থাকে।

প্রচলিত খাদ্য-সামগ্রীর প্রধান উপাদানগুলির তালিকা

আমাদের প্রচলিত খাদ্য-সামগ্রীর মোটামুটি উপাদানগুলি সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকিলে খাদ্য-নির্বাচন করা সহজ হয়; এজন্য নিম্নে কতকগুলি দ্রব্যের উপাদানের তালিকা দেওয়া হইল :—

দ্রব্য	প্রোটিন	স্নেহপদার্থ	কার্বোহাইড্রেট	লবণ পদার্থ	জল
মেষমাংস	১৯·৫	১২·৯	—	১	৬৭·৫
ছাগমাংস	২৪·১	২·৫	—	১·২	৭২
লিভার	২০·২	৩·১	২·৫	১·৩	৬৫·৫
মুরগীমাংস	১৯·৩	১৬·৩	—	১	৬৩·৭
মাছ	১৮·৬	৫·২	—	১	৭৫·৪
ভাত	২·৮	০·১	২৪·৪	০·২	৭২·৫
লুচি	৭·৫	২২·৫	৫০·০	০·৫	—

দ্রব্য	প্রোটিন	স্নেহপদার্থ	কার্বোহাইড্রেট	লবণ পদার্থ	জল
পাঁউরুটি	৯·২	১·৩	৫৩·১	১·১	৩৫·৩
আটার রুটি	৯·৪	৩·৭	৬৯·২	·৩৩	—
চিড়া	৬·২	০·১	৭৪·২	৩·৩	—
মুড়ি	৬·৩	১·২	৬৮·৩	৩·৩	—
ডিমশ্বেতাংশ	১২·৩	০·২	—	০·৬	৮৬·২
,, কুসুম	১৫·৭	৩৩·৩	—	১·১	৪৯·৫
মাতৃদুগ্ধ	২	৩·৭	৬·৪	০·৩	৮৭·৬
ছাগদুগ্ধ	৩·৮	৪	৪·৬	০·৮	৮৬·৮
গোদুগ্ধ	৩·৪	৪	৫	০·৭	৮৭
মহিষদুগ্ধ	৪·৪	৭·৩	৪·৫	০·৮	৮৩
দধি	৫·৬৩	৪·৮৫	২·৬	০·৯৭	৮৬
মাখন	১·৩	৮৪	—	১·৯	১২·৭
লেটুস শাক	১·২	০·৩	২·৯	০·৯	৯৪·৭
ডাবের জল	০·৪	১·৫	৪·৬	·৮	৯১·৫
নারিকেল শাঁস	৪·১	৩৭·৩	৭·৯	১	৪৬·৩
আপেল	০·৪	০·৫	১৪·২	০·৩	৮৪·৬
কমলালেবু	০·৮	০·২	১১·৬	০·৬	৮৬·৯
কলা	১·৩	০·৬	২২	০·৮	৭৫·৩

পরের দুইটি পৃষ্ঠায় অপর কতকগুলি খাদ্যের প্রধান তিনটি উপাদানের তালিকা দেওয়া হইল। (উহাদের শতকরা প্রায় এক ভাগ লবণ পদার্থ বাদে অবশিষ্ট সবটাই জল)।

দ্রব্য	প্রোটিন	স্নেহপদার্থ	কার্বোহাইড্রেট
কালো মাছ	১৮·৭	১·৩	—
সাদা ,,	২২·৯	৬·৫	—
গলদাচিংড়ি	১৬·৪	১·৮	০·৪
বাদাম	২১	৫৪·৯	১৭·৩
কালোজাম	১·৩	১	১০·৩
বাঁধাকপি	১·৭	০·৩	৫·৬
ফুলকপি	১·৮	০·৫	৪·৭
গাজর	১·১	০·৪	৯·৩
ঘোল	৩	০·৫	৪·৮
শশা	০·৮	০·২	২·৬
শুষ্ক খেজুর	২·১	২·৮	৭৮·৪
এঁচড়	৮·৫	০·৯	১৬·৩
বেগুন	১·২	০·৩	৫·১
পটল	০·৭৫	০·৩৬	৩·৮
মধু	০ ৪	—	৮১·২
বার্লি	১২·৭	২	৭১·০
শঠীর পালো	৩·৩৬	৩·৬	৭৫·৩৭
আখের গুড় (ঝোলা)	২·৪	—	৬৯·৩
পেঁয়াজ	১·৬	০·৩	৯·৯
চিনাবাদাম	২৫·৮	৩৮·৬	২৪·৪
ন্যাসপাতি	০·৬	০·৫	১৪·১

কড়াইশুঁটি	৭	০·৫	১৬·৯
আনারস	০·৪	০·৩	৯·৭
রাঙাআলু	২·২	০·১	১৮·৪
কুমড়া	১	০·১	৫·২
মূলা	১·৩	০·১	৫·৮
কিসমিস	২·৬	৩·৩	৭৬·১
পালংশাক	২.১	০·৩	৩·২
টম্যাটো	০·৯	০·৪	৩·৯
লেবু	১	০·৭	৮·৫
মানকচু	১·৮	১·৬	১১·৯
শালগম	১'৩	০·২	৮·১

প্রোটিন অধ্যায়ে আমিষ খাদ্যের গুণাগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে আমিষ পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়, তাহাকে উচ্চস্তরের প্রোটিন বলা হয়। পণ্ডিতেরা বিভিন্ন প্রোটিনের পুষ্টি-মান (Biological Value) স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে জানা থাকিলে খাদ্য-নির্ব্বাচনের সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া পর পৃষ্ঠায় আমাদের কয়েকটি পরিচিত খাদ্যদ্রব্যের প্রোটিনের পুষ্টি-মান দেওয়া হইল।

গোটা ডিম (শ্বেতাংশসহ)	৯৬	ময়দা	৫২
টাটকা গোদুগ্ধ	৯০	কড়াইশুঁটি	৪৮
ল্যাক্ট-অ্যালবুমিন	৮৫	মুগডাল*	৫২
মাখন তোলা শুষ্ক দুগ্ধ	৮৪	খেঁসারিডাল	৫০

ডিমের শ্বেতাংশ	৮৩	মটরডাল	৪৮
লিভার	৭৭	ছোলাডাল	৫২
মাংস	৭৬	অরহরডাল	৪৬
বাঁধাকপি	৭৬	মস্থরডাল	৩২
চাল	৭৫	কাতলা মাছ	৭৮
রাঙ্গাআলু	৭২	মৃগেল মাছ	৭২
গোলআলু	৭১	আড়	৭৫
তিল	৭১	কই	৮৭
নারিকেল শাঁস	৭০	শিঙ্গি	৮৮
ছানা	৬৯	পোয়া	৭৬
ঈষ্ট	৬৩	সরপুঁটি	৮২
চীনাবাদাম	৫৮	কোরাল	৮৩
সয়াশিম (কাঁচা)	৫৭	রোহিত	৭৯
সয়াশিম (ভাজা)	৭৫	ইলিশ	৭০

দুর্বল রোগীর পথ্য হিসাবে শিঙ্গি, কই প্রভৃতি মাছের প্রচলন অতি প্রাচীনকাল হইতেই আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উহাদের অসাধারণ উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। ডক্টর বসু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই মাছগুলি পরিপাকও হয় অতি সহজে ও সুন্দরভাবে। পুষ্টি-মানের দিক হইতে ডিম, দুধ যে

* মুগডাল হইতে ইলিশমাছ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান খ্যাতনামা খাদ্যবিদ্ ডক্টর কালিপদ বসু ডি, এস-সি, পি-এইচ, ডি, মহাশয়ের পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে।

শীর্ষস্থানীয় এবং ডালগুলি অনেক নিম্নস্তরের তাহাও জানিয়া রাখা ভাল।

বাংলার কয়েকটি পরিচিত মাছের আমিষ, স্নেহ পদার্থ এবং জলের পরিমাণ দেওয়া হইল—

নাম	প্রেটিন	স্নেহপদার্থ	জল
কাতলা	১৯·২%	২·৫%	৭০%
মৃগেল	১৯·৬	১·০	৭৪
আড়	২০·৫	২·২	৬৮
কই	১৪·৬	৮·৮	৭১
শিঙ্গি	১৬·০	১·১	৭৬
সরপুঁটি	১৭·৫	২·০	৭৪
পোয়া	১৮·৬	১·৭	৭৫
কোরাল	২১·০	১·৫	৭২

পরিচিত ডালগুলির প্রোটিনের পরিমাণ—

ডাল	শতকরা প্রোটিন
সোনামুগ	২৩·৮
মসুর	২৫·১
মটর	২২·০
মাষকলাই	২২·৭
খেসারি	৩১·৯

ছোলা	২১·৭
বরবটি	২৪·১
শিম	২০·৫

খেসারির ডালে প্রোটিন বেশী থাকিলেও উহার বেশী ব্যবহার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

পুষ্টি-মানের তালিকায় দেখা গিয়াছে, প্রাণীজ প্রোটিনের মত ডালের প্রোটিন উৎকৃষ্ট নয়, তবে গরীব লোকের পক্ষে ইহাই মুখ্য প্রোটিন; তারপর ডালে বি ভিটামিনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কার্বোহাইড্রেটও শতকরা প্রায় ৬০ অংশ থাকে, সুতরাং ইহা প্রত্যহই খাওয়া আবশ্যক।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে গোলআলু ও চাউলের প্রোটিন উচ্চস্তরের। চাউলে শতকরা সাড়ে সাত ভাগ এবং আলুতে শতকরা ২ ভাগ প্রোটিন থাকে। ঢেঁকি ছাঁটা চাউলেই প্রোটিনের পরিমাণ বেশী। সুতরাং ঢেঁকি ছাঁটা চাউলের ভাতের সঙ্গে সুসিদ্ধ ডাল এবং পাঁচমিশালী নিরামিষ তরিতরকারি খাইয়া হজম করিতে পারিলে প্রোটিনের তেমন বেশী ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে না। সঙ্গে সামান্য কিছু মাছ হইলেই মোটামুটি চলে।

———

খাদ্য ও ব্যাধি

তোমরা ভিটামিন প্রসঙ্গে জানিয়াছ যে, যদি আমরা খাদ্যের মধ্যে কোন কোনও পদার্থ না পাই তাহা হইলে বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। এগুলি হইল খাদ্যে বিশেষ কোনও উপাদানের অভাব বা অল্পতাজনিত ব্যাধি। পক্ষান্তরে আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ জন্মে ঐ সকল ব্যাধির বীজাণুর দ্বারা। তোমরা বলিতে পার ঐসব রোগের সঙ্গে খাদ্যের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? কথাটি ঠিক। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমাশয়, কলেরা ও টাইফয়েড রোগের বীজ খাদ্যপানীয়ের সহিতই শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে, এজন্য খাদ্যবিষয়ে যথেষ্ট সাবধান থাকিতে হয়। রাস্তার ধারে খোলা অবস্থায় যে সন্দেশ বা শোনপাঁপড়ি বিক্রয় হয় উহা বিষবৎ মনে করিবে। কত ধূলা, বালি, মাছি যে উহাতে পড়ে তাহা তোমরা নিজেরাই দেখিয়া থাকিবে। আর উহারাই যে আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু বহিয়া আনে তাহা তোমাদিগকে নূতন করিয়া বলিবার দরকার করে না। দোকানের ফল মূলও বাড়িতে আনিলে উহা ধুইয়া খাওয়া দরকার। কলেরা দেখা দিলে বাজার হইতে আনীত তরিতরকারি, শাকসবজী পটাস পারমাঙ্গানেটের জলে ধুইয়া লওয়া বিধেয়। সস্তায় পাওয়া গেলেও বাজারের পচা আম, কাটা তরমুজ, ফাটা

ফুটি কিনিবে না—হাত না ধুইয়া খাদ্যদ্রব্য ধরিবে না। ঠাকুরমা, পিসীমাকে অনেক সময় তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনে হয়, কিন্তু বড় হইলে বুঝিবে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্বাস্থ্য এবং সমাজরক্ষার অমূল্য নীতি ধর্মের অঙ্গস্বরূপ করিয়া জাতির কল্যাণই করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। স্থানকাল পাত্রভেদে জ্ঞানের আলোকে সব জিনিস যাচাই করিয়া চলাই সঙ্গত। বাসি বা পচা খাদ্য সর্বথা বর্জনীয়। দুধ ভাল করিয়া না ফুটাইয়া খাওয়া অনুচিত। দুধের মধ্যেই ব্যাধিবীজাণু সহজে বিস্তার লাভ করে; একারণ দুধে কদাচ মাছি প্রভৃতি না বসে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। জলই মানুষের জীবন—আবার অবিশুদ্ধ জলেই মৃত্যুদূতেরা বাস করে। কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের বীজাণু অবিশুদ্ধ জলে অনেক সময় থাকে। জল ফুটাইয়া লইলে ব্যাধি-বীজ নষ্ট হয়। বরফ খাওয়াও বিপজ্জনক। কারণ উহার মধ্যে মারাত্মক ব্যাধিবীজ অনেক সময়েই দেখা যায়। যদি বরফ থাকে এবং বেশী ঠাণ্ডা জল খাইবার আগ্রহ হয় তবে ভাল জল পূর্ণ পাত্র বরফের মধ্যে বসাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া সেই জল খাওয়া সঙ্গত। অনেকে এইরূপ করিয়া থাকেন, দেখিয়াছি।

পোষাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার মত বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা এবং বাসগৃহের আশপাশ পরিষ্কার রাখাও প্রয়োজনীয়। নিজের হাতে একাজ করিতে শৈথিল্য বা লজ্জা প্রকাশ করা উচিত নয়। ছেঁড়া কাগজ ও অন্যান্য আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলিয়া নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত পাত্রে ফেলিবে। জার্মানি,

সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রাস্তার মোড়ে, ট্রামের মধ্যে অবধি ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতি রাখার পাত্র থাকে ; লোকে কদাচ কিছু উহার বাহিরে ফেলিয়া নোংরামির প্রশ্রয় দেয় না। ডি ডি টি প্রভৃতি ছিটাইয়া ঘরের ও বাড়ির আশপাশের মশা-মাছি নির্মূল করিলে অনেক ব্যাধিবীজও যে তাহাতে ধ্বংস হয়, তাহা তোমরা জান। পুষ্টিকর, বিশেষ করিয়া উপযুক্ত আমিষ খাদ্যের অভাবে ক্ষয়রোগ সাধারণতঃ জন্মে, ইহাও মনে রাখিবে।

আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপযুক্ত খাদ্য ও উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা শরীর সুদৃঢ় ও সুগঠিত থাকিলে ব্যাধি-বীজ শরীরে ঢুকিলেও অনেক সময় উহা রোগ জন্মাইতে পারে না। কারণ আমাদের দেহে রক্তের যে শ্বেত কণিকা আছে সেগুলি পরিমাণে বেশী এবং শক্তিশালী থাকিলে অনেক ব্যাধিবীজকেই তাহারা ধ্বংস করিতে পারে। এই কারণেই আগন্তুজ বা ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্যের প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তারপর মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ যখন কোনও সংক্রামক ব্যাধির আশঙ্কা দেখা দেয় তখন দেহের ব্যাধিবীজনাশক স্বাভাবিক শক্তি বাড়ানোর জন্য টিকা লওয়া দরকার। টিকা লও-য়ার মোদ্দা মানে হইতেছে—কোনও ব্যাধিবীজকে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা দুর্বল করিয়া তাহা আমাদের দেহে ঢুকাইয়া দেওয়া। অপেক্ষাকৃত অল্পতেজী এই ব্যাধিবীজগুলি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে শরীরের রক্ষীবিভাগ অর্থাৎ রক্তর শ্বেত কণাগুলি

আগন্তুকের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সতেজ হইয়া ওঠে এবং পরে ঐ জাতীয় জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে তাহারা অবিলম্বে নবাগত বীজাণুকুলকে নির্মূল করিতে পারে। গত মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে জাপান যেমন চীনের সঙ্গে লড়িয়া এবং ইটালি আবিসিনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া হাত পাকাইয়াছিল—টিকা লওয়া অনেকটা সেই ধরণের ব্যাপার। সুতরাং টিকা লইতে তোমরা কদাচ অবহেলা করিবে না বা অমনোযোগ দেখাইবে না।

শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার জন্য সচেষ্ট হওয়া কেবল যে তোমাদের নিজেদের জন্যই দরকার তাহা নয়, পরন্তু পরিবারের এবং সমাজের কল্যাণের দিক হইতেও উহা অবশ্য করণীয়। তোমাদের অসুখ বিসুখে মাতাপিতা কিরূপ যন্ত্রণা পান ও উদ্বিগ্ন হন, তাহা তোমাদের অজানা নাই। তারপর সংক্রামক ব্যাধি পল্লীগ্রামের আগুনের মত—একজনের ঘরে ধরিলে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িতে পারে। রোগে ভুগিলে পরীক্ষায় সুফল লাভ করা যায় না, ফলে লোকের কাছে নিজেকে এবং অভিভাবক-গণকে অপ্রস্তুত হইতে হয়। উপার্জনশীল লোক রোগে পড়িলে অর্থাভাবে সমস্ত পরিবারেরই কষ্টের সীমা থাকে না।

বহিঃশত্রুর আক্রমণে রাজ্য যেমন পর্যুদস্ত ও নিঃস্ব হয়, অন্তঃশত্রু—এইসব ব্যাধির প্রসারেও দেশ বা রাজ্য চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। খাদ্যাভাব এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবহেলাবশতঃ আমাদের দেশে এই অন্তঃশত্রুর প্রকোপ বড় বেশী। ইহা জাতীয় উন্নতির ভীষণ পরিপন্থী। মহামানব রবীন্দ্রনাথ ইহা উপলব্ধি করিয়া যে আক্ষেপ উক্তি করিয়াছিলেন

তাহা তোমাদের জানা উচিত মনে করিযা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল:—

"আধমরা মানুষ নিয়ে কোনো বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হইয়া হ'য়ে ওঠে। আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে—কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস করে—গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্য স্থানে অল্পই পৌঁছয়। লোকসানের হিসাব বিচারের সময় আমরা নানা নেতার নানা মত, নানা প্রণালী নিয়ে বকাবকি, এমন কি, হাতাহাতি করে থাকি, এদিকে রোগে আমাদের শক্তিকে যে চালুনীর মত শতছিদ্রময় করে দিয়েচে এই কথাটা যথেষ্ট পরিমাণে আমলের মধ্যে আনিনে। যখন দেখি দেশে যথেষ্ট ধন উৎপন্ন হয় না তখন বলি চরখা চালাও, তাঁত বোনো, চাষ করো—কিন্তু যে হাতে এই সব কাজ চলবে সেই হাতে চেপে বসেচে যমের পেয়াদারা। পাঁচ জন লোকে বহুকষ্টে দেড়জন লোকের মত কাজ করে অথচ পাঁচ মুখেই তারা খায় এবং পাঁচখানা দেহকেই কাপড় পরাতে হয়।"

রোগে যে দেশের কি অপরিপূরণীয় অসীম ক্ষতি করে কবীন্দ্রের এই উক্তি হইতেই তোমরা তাহা মর্মেমর্মে বুঝিতে পারিলে। আমি আবার তাই বলি—তোমরা খাদ্যও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি আচারনিষ্ঠভাবে পালন করিয়া নিজেরা অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে এবং তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও কর্মের প্রভাবে পরিবার,

প্রতিবেশী, সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন পূর্বক মানব জন্ম ধন্য করিবে। নিজেরা জাগ্রত ও শক্তিমান্ হও এবং আপামর সাধারণকেও তোমাদের আদর্শের তেজে জাগাও এবং শক্তিমান্ করিয়া তোলো।

রোগীর পথ্য

কয়েকটি বিশিষ্ট রোগে খাদ্য বা পথ্য সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, এখন তাহা বলা হইতেছে। জ্বর বা পেটের অসুখ হইলে তোমরা ভাত খাইবার জন্য বায়না কর কিন্তু অভিভাবকগণ কেন যে ঐ অবস্থায় তোমাদের ভাত খাইতে নিষেধ করেন তাহা বুঝিলে ভবিষ্যতে তোমরা আর ঐরূপ করিবে না নিশ্চয়ই। "পরিপাক যন্ত্র ও উহার ক্রিয়া" নামক অধ্যায়ে দেখিয়াছ শরীরের মধ্যে কত বিভিন্ন যন্ত্রের সমবেত চেষ্টায় ভুক্ত পদার্থ আমাদের শরীরের গ্রহণ-যোগ্য হয়। দৈহিক অসুস্থতায় ঐ যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় বা ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধ হইয়া যায়; কাজেই ঐ অবস্থায় ভাত মাছ খাইলে উহা হজম না হওয়ায় নানারূপ দূষিত পদার্থের সৃষ্টিতে শরীরের ক্ষতির সম্ভাবনা। ভাত রুটি হজমের ক্ষমতা না থাকিলে গ্লুকোজ খাওয়ানো বা ইনজেকশন দেওয়া হয়। কারণ তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ পরিপাক ক্রিয়ায় ভাত রুটি শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজেই পরিণত হয়। আমিষ পদার্থ খাইতে

না দিয়া স্থলবিশেষে প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট বা বিশেষ কোনও অ্যামিনো অ্যাসিড ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থাও এই কারণেই।

আমাদের সকলেরই কোনো না কোনো সময়ে যে কোনো অসুখ হইতে পারে। তারপর প্রিয়জনদের কখন্ কাহার কি অসুখ হইবে বলা যায় না। সুতরাং পথ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ—অর্থাৎ স্নেহ-প্রীতির সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ ঘটিলে আমরা অধিকতর নিপুণতার সহিত রোগীর সেবা শুশ্রূষা এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারি। এই কারণেই নিম্নে কয়েকটি সাধারণ রোগের পথ্য সমন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

টাইফয়েড

পূর্বেই তোমরা দেখিয়াছ এই ভীষণ ব্যাধির বীজাণু সাধারণতঃ দুধ, জল এবং খাদ্যের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। এই রোগের আক্রমণের পর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে শরীরের ক্রিয়া বা ভাঙাগড়া (metabolism) খুব বৃদ্ধি পায়, এই সময়ে রোগীর দেহের পেশীর প্রোটিন ক্ষয় হইতে থাকে। এই জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তরল বা অর্ধ তরল অবস্থায় দেওয়া দরকার। ছানার জল, ডালিম-বেদানা, কমলা:লেবু, টম্যাটো বা আঙুরের রস, ডাবের জল সাধারণতঃ পথ্য দেওয়া হয়। উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ না করিলে রোগীর অন্ত্রের পেশী ছিদ্র হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। গ্লুকোজ এবং আজকাল প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

চিকিৎসাবিদ্‌গণ বলেন, টাইফয়েডে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত কার্বোহাইড্রেট খাদ্য ও সাধারণ পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্যে সুফল পাওয়া যায়। তারপর ঐ ব্যারামে যে সব ঔষধ দেওয়া হয় তাহাদের বিষক্রিয়া নষ্ট করিবার জন্য কমলালেবুর রস ও বিবিধ ভিটামিন বিশেষ উপকারী।

নিউমোনিয়া

জ্বর থাকা কালে এই ব্যারামেও প্রোটিনের খরচা খুব বেশী। রোগের সঙ্কটকাল (crisis) কাটিয়া গেলেও অনেকদিন অবধি এই ক্ষয় চলিতে থাকে। নিউমোনিয়াতেও কমলালেবু, আঙুর মিষ্ট টম্যাটো প্রভৃতি ফলের রস, ছানার জল, দুধ, গ্লুকোজ, প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট এবং প্রচুর ভিটামিন সি ও বি-র ব্যবস্থা আবশ্যক। সালফোনঅ্যামাইড জাতীয় যে সব ঔষধ এই রোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলির প্রভাবে রোগীর অন্ত্রের মধ্যে যে সব বি ভিটামিন তৈরি হতে পারে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটে ; কাজেই রোগীকে প্রচুর বি ভিটামিন দিতে হয়। ভিটামিন সি ত নিউমোনিয়াতে বিশেষ হিতকর বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরেও ঐরূপ পথ্যাদিই বিধেয়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য

শহর-বাসীদের মধ্যে আজকাল এই রোগ বেশী দেখা যায়। শাকসবজী প্রসঙ্গে পূর্বেই ইহার প্রতিকারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অল্পতা, শাক প্রভৃতি আঁশসংযুক্ত আহার্যের ও বি-ভিটামিনের অভাব, অতিভোজন,

সাদা চিনি ও চা বেশী খাওয়া, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, জল কম খাওয়া, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি কারণে ইহা সচরাচর জন্মে। ভিটামিন বি-র অভাবে অন্ত্রের সম্যক্ সঞ্চালন হয় না; সাদা চিনিতেও ঐ দোষ ঘটায়। তদ্ভিন্ন সাদা চিনি বেশী খাইলে উহা অন্ত্রের মধ্যে এতবেশী জল শোষণ করিয়া লয় যে, তাহাতে মল বেশী শক্ত হইয়া পড়ে। চায়ের ট্যানিন নামক কষায় পদার্থ অন্ত্রের সঙ্কোচন করায় উহার রক্তবাহী শিরাগুলি অনেকটা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই হেতু অতিরিক্ত চা পানে কোষ্ঠ কাঠিন্য জন্মিতে দেখা যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য ঘোড়ায় চড়া, হাঁটা, দাঁড়টানা, সাঁতার দেওয়া বা বাগানের কাজ করা ভাল। যাহাদের সারাদিন বসিয়া লেখাপড়া প্রভৃতির কাজ করিতে হয় তাহাদের পক্ষে সকাল বিকালে বেড়ানো বা বাগানের কাজ করা নিতান্ত দরকার। ডুমুর, ঢেঁড়স, থোড়, শাকসব্জী, পেঁয়াজ, শুকনো খেজুর, কিসমিস, মধু, ঝোলাগুড়, আম, ন্যাসপাতি, প্রভৃতি ফল উপকারী। সকালে শুধু পেটে এবং রাত্রে শুইবার সময় ঠাণ্ডা জল খাওয়াও হিতকর। পুনঃপুনঃ জোলাপ লওয়া ক্ষতিকর। ফলতঃ শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়ানো এবং খাদ্য বিষয়ে যে নির্দেশ দেওয়া হইল উহা পালন করিয়া কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করার চেষ্টা করাই সমীচীন।

ডিসপেপসিয়া

পরিপাক ক্রিয়ার স্থায়ী গোলমাল বা অনিয়মকে এক কথায় বলে ডিসপেপসিয়া। কয়েকদিন কোষ্ঠ কাঠিন্যের পর আবার

কয়েকদিন পাতলা দাস্ত হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক দুর্বলতা ও অবসাদ ইহার প্রধান লক্ষণ। নানা কারণে ডিসপেপসিয়া জন্মিতে পারে—অতিভোজন, অনিয়মিত সময়ে আহার, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বা অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম, ভাল করিয়া না চিবাইয়া বা পরিশ্রান্ত অবস্থায় খাওয়া, স্নায়বিক অবসন্নতা, মানসিক অশান্তি, উদ্বেগ, পাকস্থলীর ঘা প্রভৃতির দরুন সাধারণতঃ ডিসপেপসিয়া জন্মে।

ডিসপেপসিয়াতে অধিক মসলা সংযুক্ত আহার্য বর্জনীয়। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম উপকারী। মাঝে মাঝে উপবাস দিয়া পরিপাক যন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়া এবং যথা সম্ভব উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া খাওয়া বিধেয়। বায়ু পরিবর্তনে এই রোগে বেশ ফল পাওয়া যায়।

অম্লরোগ

আহারের সময় ঠিক না থাকিলে এবং তৎসঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রম, মানসিক দুশ্চিন্তা, অতিভোজন প্রভৃতি হইতে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

অম্লরোগে আঁশহীন পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাদ্য উপকারী। দুধ, ডিম, ননী, যতটা সহ্য হয়—খাওয়া উচিত। পাকস্থলীতে ঘা হইলে কমলা লেবু ও মিষ্ট টম্যাটোর রস উপকারী। কমলা লেবুর রসে যে শর্করা থাকে উহা পাকস্থলীর ক্ষুধার সময়ের সঙ্কোচন (hunger contraction) রোধ করে এবং ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণারও লাঘব হয়। বিশেষ খারাপ অবস্থা কাটিয়া

গেলেও লঙ্কা ও গোলমরিচের ঝাল, সরিষা, মূলা, কোনও প্রকার উগ্র মসলা অথবা মাংসাদি গুরুপাক খাদ্য অনেকদিন অবধি না খাওয়া ভাল। এই রোগে সহজ পাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য অল্প অল্প করিয়া দিনের মধ্যে ৫।৬ বার ধরিয়া খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় অথচ পাক-যন্ত্রের উপরও বেশী চাপ পড়ে না।

স্থূলতা

তোমরা কেহই অতিরিক্ত মোটা হইতে চাও না নিশ্চয়ই। শরীরের আবশ্যক খাদ্যের চেয়ে অতিশয় বেশী খাইলে তলপেটে ও অন্য পেশীতে মেদ জমিয়া স্থূলতা সৃষ্টি করে। কয়েকদিন আহার্য না পাইলেও স্থূল লোকের তেমন বেশী ক্ষতি হয় না; কারণ ঐ মেদ ভাঙিয়া শরীরের অত্যাবশ্যক ক্রিয়া চলে। সুতরাং শরীরে মেদবৃদ্ধি মানে অনেকটা খাদ্যদ্রব্য যেন সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া বেড়ানো। এই ভার বহন করা দেহীর পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, শরীরের অনেক অত্যাবশ্যক যন্ত্রের উপর চাপ দেওয়ায় ইহা তেমনই ক্ষতিকর এবং দেখিতেও খুব নয়নতৃপ্তিকর নয়। স্থূলতাকে ইংরেজিতে বলে ওবেসিটি (obesity)—ইহা একটি রোগবিশেষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে সাধারণতঃ স্থূলতা জন্মিতে দেখা যায়:—

(১) অতিভোজন এবং শারীরিক শ্রমের অভাব বা অল্পতা

(২) বংশানুক্রমিক (অর্থাৎ পিতামাতা স্থূল হইলে উহা হইবার সম্ভাবনা।)

(৩) থাইরয়েড, পিটিউটারি প্রভৃতি গণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়াবশতঃ

অতিরিক্ত স্থূলতায় হৃদযন্ত্র, রক্তনালী এবং মূত্রাশয়ের পীড়া জন্মিতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধি এবং বহুমূত্র রোগও স্থূলতার সঙ্গেই সাধারণতঃ দেখা যায়। মোটা কমানোর জন্য বেশী তাড়াতাড়ি করা অনুচিত। ফলতঃ খাদ্য সম্ভবমত কমাইয়া অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তি খরচ করা দরকার। অর্থাৎ ব্যায়ামও দৈনন্দিন কার্যের জন্য যতটা খাদ্য দরকার তার চেয়ে কম খাদ্য খাইতে হইবে—যাহাতে অবশিষ্ট শক্তি সঞ্চিত খাদ্য বা মেদ ভাঙিয়া আসে। মনে কর, একজনের ব্যাঙ্কে বহু টাকা আছে ; এখন যদি ঐ লোকের দৈনিক খরচ ২০৲ টাকা হয় অথচ দিনে সে ১০৲ টাকা মাত্র আয় করে তবে তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিদিনের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ১০৲ টাকা করিয়া তুলিয়া সংসার চালাইতে হইবে। মোটা কমানের জন্য এইমাত্র যাহা বলা হইল তাহা অনেকটা এইরূপ ব্যাপার।

স্থূলতায় স্নেহপদার্থ এবং কার্বোহাইড্রেট খাদ্য যথাসম্ভব কম খাওয়া উচিত। ডাল, ডিম, ডিমের কুসুম এবং যে সব মাছে তেল কম সেইরূপ মাছ অল্প পরিমাণে খাইয়া তাহার সহিত পালং, লেটুস, বাঁধাকপি ও অন্যান্য শাক বেশী খাওয়া ভাল। টম্যাটো, কমলালেবু প্রভৃতি খাইয়া ভিটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করা উচিত। জল যথাসম্ভব বেশী খাওয়া ও

শারীরিক পরিশ্রম করা বিধেয়। কোনও কোনও চিকিৎসক স্থূলতায় কেবলমাত্র দুধ, (দৈনিক দুই সের পর্যন্ত খাঁটি গোদুগ্ধ) পান করিতে দিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

ক্ষয়রোগ

যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ যদিও বীজাণুঘটিত ব্যাধি তথাপি উহা যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই অনেক সময় ঘটিয়া থাকে তাহা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানির খাদ্যসংকটের সময় ঐ রোগের বিস্তার দেখিয়া বুঝা গিয়াছে। অবশ্য আমাদের দেশে ত ইহা সর্বদাই লক্ষ্য করিতেছি। পুষ্টিকর আহার্য ব্যতীত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও শারীরিক শ্রমের অভাবে এ রোগের আক্রমণ বেশী হইতে দেখা যায়। আমাদের অনেক আপাতঃ সচ্ছল পরিবারেও গয়না বেশ-ভূষা প্রভৃতির প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় খাদ্যের উৎকর্ষের প্রতি সেরূপ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। অবস্থা খুব বেশী ফিরিলেই বাহিরের চাকচিক্য—আসবাব মোটরকার প্রভৃতির ব্যয়বরাদ্দ যত বাড়ে খাদ্যের দফায় সেরূপ বাড়িতে দেখা যায় না। বাঙালী পরিবারে মেয়েদের খাবারের প্রতি অনেকেই তেমন নজর রাখেন না ; অথচ মেয়েদেরই যে পুষ্টিকর খাদ্য বেশী দরকার তাহা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে উদাসীন বলিয়াই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী লক্ষিত হয়।

যক্ষ্মারোগীকে মাখন জাতীয় পদার্থ বেশী দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অল্প প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট খাদ্য এবং প্রচুর ভিটামিন দেওয়া

সঙ্গত। দুধ, ডিম, কমলালেবু,টম্যাটো, আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফলের রস, রুটি বা ভাত, দধি, কচিমাংস, ঘি-মাখন, সহজপাচ্য টাট্‌কা শাকসব্জী প্রভৃতি যক্ষ্মারোগীর পক্ষে উপকারী। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন—যতদিন রোগীর পরিপাকশক্তি ঠিক থাকে ততদিন তাহাকে বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়া তাহার শরীরের ক্ষয় যথাসম্ভব পূরণ করা কর্তব্য।

বাতরোগ

ইউরিক অ্যাসিড নামক পদার্থের সোডিয়ম ঘটিত লবণ গ্রন্থিতে জমিয়া বাত জন্মায়। সুস্থ অবস্থায় রক্তের ইউরিক অ্যাসিড মূত্রযন্ত্রে ভাঙিয়া মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। যকৃৎ এবং মূত্রযন্ত্র বা কিডনি ভাল থাকিলে এই রোগ সাধারণতঃ জন্মে না। অনেক দিন ধরিয়া অনুপযুক্ত খাদ্য খাইলে এবং খাদ্যে বি-ভিটামিন ও সি-ভিটামিনের অল্পতা ঘটিলে এই রোগ জন্মে। বাতরোগে দুধ, রুটি, ভাত, গোলআলু, ঘৃত, মাখন, চিনি এবং অল্পমাত্রায় ডিম খাওয়া এবং মিষ্ট আম, কলা, কমলালেবু, আনারস, আঙুর, খেজুর, আপেল, পেঁপে, বেল প্রভৃতি ফল খাওয়া হিতকর। মাংস, মেটে, গলদাচিংড়ি, পেঁয়াজ, ডাল, শিম, প্রভৃতি না খাওয়া ভাল। বাতরোগীর পক্ষে বেশী জলপান উপকারী। মাঝে মাঝে মৃদু জোলাপ লওয়াও বিধেয়। খাদ্যবিষয়ে সংযম, নিয়মানুবর্তিতা এবং উল্লিখিত নিয়মগুলি পালন করা বাতরোগীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক ও প্রসূতির খাদ্য

অন্তরাপত্য অবস্থায় মেয়েদের খাদ্যে প্রোটিন, ক্যালসিয়ম, ফসফেট, ভিটামিন, এ, ডি, বি, সি প্রভৃতি সবই প্রচুর পরিমাণে থাকা বাঞ্ছনীয়। দুধ, ডিম, মাছের তেল, পাঁঠার মেটে, কচি শাক সব্জি প্রভৃতি সরবরাহ করা উচিত। এই অবস্থায় মেয়েদের সাধ খাইতে দিবার যে সামাজিক প্রথা আছে তাহার উদ্দেশ্য হইল—তাহাদিগকে মুখরোচক, পুষ্টিকর খাদ্য দানেরই ব্যবস্থা। পরন্তু একদিনের জন্য নয়—বরাবরই তাহাদের খাদ্যের প্রতি নজর রাখিলে এই অবস্থায় তাহাদের শরীর নষ্ট হইতে পারে না এবং নবজাত শিশুও সুস্থ এবং সবল হইবার সম্ভাবনা থাকে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সাধারণ লবণ যথাসম্ভব অল্প খাওয়া ও জল বেশী খাওয়া উচিত। প্রসূতির খাদ্যও খুবই পুষ্টিকর হওয়া দরকার; যেহেতু মাতৃদুগ্ধে স্নেহপদার্থ, শর্করা, ক্যালসিয়ম এবং ভিটামিন প্রত্যহ কম পরিমাণে নিঃসৃত হয় না। এই কারণেই প্রত্যহ তাহার খাদ্যে এগুলি পূরণের ব্যবস্থা না করিলে মাতার শরীরের সঞ্চিত ঐ সব পদার্থ ভাঙিয়া আসিতে থাকে। অবশ্য মায়ের খাদ্যে ভিটামিন এ, বি, ডি প্রভৃতি না থাকিলে দুগ্ধে এই সব উপকারী পদার্থ কম থাকার দরুন শিশুর শরীর সম্যক ভাবে গঠিত হইতেও পারে না। বলা বাহুল্য, মায়ের রুচি ও পরিপাকের শক্তি অনুযায়ী তাহাকে দুধ, ডিম, দধি, ভাল মাছ, পাঁঠার মেঠে, শাকসবজি প্রভৃতি যথাসম্ভব খাওয়ানো দরকার।

শিশুর খাদ্য ও দুগ্ধ

কোনও প্রাণীর দুগ্ধ ঠিক সেই প্রাণীর নবজাত শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। একমাত্র লৌহ বাদে দুধের লবণ-পদার্থগুলি ঠিক সেই জাতীয় শিশুর শরীরের ধাতব পদার্থের সঙ্গে সমান অনুপাতে থাকে। নবজাত প্রাণীর পাকস্থলীর 'রেনিন' তাহার মাতৃদুগ্ধের ছানাজাতীয় পদার্থকে যে ভাবে জমাট বাঁধিতে পারে, অন্য প্রাণীর দুধের উপর তাহার সেরূপ সুন্দর ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। তারপর মাতৃদুগ্ধে অন্য প্রাণীর দুধের চেয়ে দুগ্ধশর্করার (ল্যাকটোজ) পরিমাণ বেশী দেখিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা যে, ইহার উপরেই মানুষের উন্নত প্রকারের মস্তিষ্ক-গঠন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এই কারণেই শিশুকে পারত পক্ষে অন্য দুধ না খাওয়ানোই ভাল।

কতকগুলি পরিচিত দুগ্ধের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

	মাতৃদুগ্ধ	গোদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ	অশ্বদুগ্ধ	গর্দভদুগ্ধ
প্রোটিন	১·৫	৩·০	২·৮	১·৯	১·৬
স্নেহপদার্থ	৩·৫	৩·৯	৩·৪	১·০	০·৯৩
শর্করা	৬·৫	৫·০	৩·৮	৬·৩৩	৫·৬
লবণপদার্থ	০·২	০·৭	০·৯৫	০·৪৫	০·৩৬
জল	৮৮·৩	৮৭·৪	৮৯·০৫	৯০·৩২	৯১·৫১

ইহা হইতে তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, মাতৃদুগ্ধ কোনও

প্রাণীর দুধের সহিতই মেলে না—গর্দভ এবং অশ্ব দুগ্ধের সহিত প্রোটিন এবং শর্করাতে ইহার অনেকটা মিল দেখা যায় মাত্র। এই কারণে যে সব নবজাত শিশুর ভাগ্যে মাতৃদুগ্ধ না জোটে, তাহাদের পক্ষে গর্দভ দুগ্ধ উপকারী বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক ধনাঢ্য পরিবারে নানা কারণে শিশুর ভাগ্যে মাতৃদুগ্ধ না জোটায় হতভাগ্যদিগকে গর্দভের দুগ্ধে প্রতিপালন করা হয় বলিয়া শোনা যায়। বিলাতে মাতৃদুগ্ধও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা হওয়ায় সে দেশে এই অভাব অনেকটা মিটিয়াছে।

তালিকাতে তোমরা দেখিলে— গোদুগ্ধে প্রোটিন ও লবণ পদার্থ মাতৃ দুগ্ধের চেয়ে বেশী ; সুতরাং মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে শিশুকে গোদুগ্ধ দিতে হইলে উহা পাতলা করা প্রয়োজন ; কিন্তু পাতলা করিলে স্নেহ পদার্থ ও শর্করার পরিমাণ যায় কমে। তোমরা জান যে, গোয়ালাদের দুগ্ধ-পাত্রের উপরের অংশে বেশী মাখন থাকে। সুতরাং সেই দুধ লইয়া বিশুদ্ধ জল দিয়া পাতলা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধশর্করা মিশাইয়া তাহা মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে খাওয়ানো চলে। অনেকে গোদুগ্ধে বার্লির জল দিয়া পাতলা করিতে বলেন। তবে নবজাত শিশুর পক্ষে বার্লির কর্বোহাইড্রেট হজম করা শক্ত বলিয়া উহা না করাই ভাল। শিশুর তিনমাস বয়সের পর হইতে দুধের সহিত স্বল্পমাত্রায় বার্লি-জল মিশানো যাইতে পারে। বার্লি থাকার জন্য গোদুগ্ধ শিশুর পাকস্থলীর রেনিনের ক্রিয়ায় বেশী শক্ত ডেলা বাঁধিতে পারে না—ফলে পরিপাকের সুবিধা হয়। দুধের সহিত

স্বল্প পরিমাণে চুনের জল, জল এবং সোডিয়ম সাইট্রেট মিশাইয়া খাওয়ানোতেও উপকার হয় বলিয়া জানা যায়। গোদুগ্ধের প্রোটিন যথাসম্ভব কমাইয়া শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত। অন্যথা শিশুর যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির অযথা পরিশ্রম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহার ক্ষতি হয়। একটু বয়স হইলে মাঝে মাঝে কালমেঘের পাতার রস খাওয়ানোতে যকৃতের দোষ কাটিয়া যাওয়ায় শিশু ভালভাবে বাড়িতে পারে, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রত্যেক শিশুকেই ৮।৯ মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ সেবন করানো উচিত। অবশ্য মায়ের খাদ্যের উপরও বিশেষ নজর রাখা কর্তব্য। শিশুকে নিয়মিত সময়ে স্তন্যদান তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে সবিশেষ উপকারী—মায়েরা একথা যেন কদাচ না ভুলে যান।

বালক বালিকাদের খাদ্যের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন অভিভাবকদের জন্য কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

বৈষ্ণব প্রভাবের দরুন বা ছেলেবেলা হইতে মাংস ডিম্বাদি না খাওয়াতে অনেক পরিবারে উহার প্রচলন থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের ছেলে পিলে জন্মিলে তাঁহারা যেন একটু উদারতা অবলম্বন করেন, নতুবা শুধু ডাল খাইয়া তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় পুত্রকন্যা ডাল (dull) হইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাম্য নয়। সত্য বটে, আমাদের অনেকেরই পিতা পিতামহ গ্রামে মাংস-ডিম্বাদি না খাইয়াও সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দুধ-মাছের যে প্রাচুর্যের মধ্যে

পালিত হইয়াছিলেন সে সুবিধা ত বর্তমানে আমাদের নাই। সুতরাং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে খাদ্য পদ্ধতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; অন্যথা ব্যাধি, মৃত্যু, শোক ও অশান্তি বরণ করিতে হইবে।

আমার একজন শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক নিজে মাংস-ডিম্বাদি কোন দিনই খান না; কিন্তু তাঁহার ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি নিয়মিত এই সব খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই ছেলে মেয়েরা, শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছে। আমিষ-নিরামিষ প্রসঙ্গে অন্যত্র স্বামী বিবেকানন্দের যুক্তিপূর্ণ অমোঘ বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহা আবার পড়িয়া অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বৃদ্ধদের খাদ্য সম্বন্ধেও অনেকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন যুগের খাদ্যের কথা

তোমরা জানো যে, মানুষ শুধু বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আগে যাহারা ছিল তাহারা কি করিত, কি খাইত ইত্যাদি কথা জানিবার জন্য তোমরা স্বতই ঔৎসুক্য বোধ কর। জার্মান মহাকবি গ্যেটে বলিয়াছেন—'তিন হাজার বছরের যে না রাখে খবর সে আছে অন্ধকারে

অজ্ঞ হয়ে; করে যাচ্ছে শুধু দিন মজুরি।' বাস্তবিক পুরাতন খবর ভাল জানা থাকিলে আমাদের চলার পথ সুগম হয় এবং নূতন পথে চলা ও নূতন পথ আবিষ্কার করাও সহজ হইয়া পড়ে। অবশ্য অতি প্রাচীনকালের মানুষের আচার ব্যবহারের সঠিক খবর পাওয়া বড়ই কঠিন। অতি প্রাচীন পুঁথির বয়সও হয়ত চার পাঁচ হাজার বৎসরের বেশী নয়; সুতরাং বহুক্ষেত্রে আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়।

পণ্ডিতেরা বলেন, অতি প্রাচীনকালে মানুষ আমাদের মত ঘর বাড়ি বাঁধিয়া বাস করিত না। তাহারা যাযাবর অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত। পাহাড়ের গুহা বা গাছের কোটর ছিল তাহাদের আশ্রয়স্থল। পাথর ছুড়িয়া বা গাছের ডাল দিয়া আঘাত হানিয়া ছোট ছোট জীবজন্তু ও মৎস্যাদি ধরিয়া এবং বনের ফলমূল খাইয়া তাহারা দিন কাটাইত। ফলতঃ এই যুগে প্রাণীজ খাদ্যই ছিল প্রধান; কাজেই তাহাদের গায়ে শক্তিও ছিল অসাধারণ। আর শক্তির দরকারও ছিল প্রচুর; কারণ হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে যুঝিয়া তাহাদের সতত আত্মরক্ষা করিতে হইত। ইহার পরের যুগে তাহারা গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুকে পোষ মানাইয়া তাহাদের দুগ্ধাদি খাইতে থাকে এবং ক্রমশঃ গরুর সাহায্যে চাষবাস শুরু করে। কৃষি অবলম্বন করিবার পর মানুষ ঘরবাড়ি করিয়া অনেকটা স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে এবং এই সময় হইতে চাউল, গম প্রভৃতির দরুন তাহাদের খাদ্য কার্বোহাইড্রেট্‌প্রধান

হইয়া ওঠে। অবশ্য যে সব পশু ইহারা পালন করিত তাহাদের মাংস এবং দুধও ইহাদের খাদ্য ছিল। বৈদিক যুগের আর্যদের সম্বন্ধে এইরূপ খবরই আমরা জানি। যখন কোনও স্থানের ভূমির উর্বরতা শক্তি কমিয়া যাইত তখন ইহারা পুরাতন আবাস ছাড়িয়া নূতন দেশে যাইতে বাধ্য হইত। এইরূপে আর্যদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। একটি শাখা আসে ভারতবর্ষে—ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে তাহারা ক্রমে বসবাস আরম্ভ করে। সুতরাং বৈদিকযুগের হিন্দুদের মাংস ও দুধ প্রিয় খাদ্যই ছিল। অতঃপর রামায়ণ মহাভারতের—অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের যে খবর পাওয়া যায় তাহাতে রাজরাজড়াদের মৃগয়াতে বন্য বরাহ, বন্যকুক্কুট, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীবধ করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণের বিষয় আমরা জানিতে পারি। বিরাট রাজার বিপুল সংখ্যক গোধন ছিল দেখিয়া মনে হয় দুধ এবং দুধের তৈরি খাদ্যাদিরও সে যুগে খুবই প্রচলন ছিল। কাজেই প্রাণীজ প্রোটিন-ভোজী পৌরাণিক যুগের লোকদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী যে চমকপ্রদ হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ভারতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ধর্মজগতের পক্ষে যেমন মহা গৌরবের বিষয়, জাতীয় জীবনে কিন্তু ইহার প্রভাব তেমন নয়। কারণ জীবহিংসা নিষিদ্ধ হওয়ায় চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচার হইতে বিরত হন; ফলে চিকিৎসা-বিদ্যার অবনতি হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ায় জাতি শারীরিক শক্তি ও তৎসঙ্গে উৎসাহ উদ্যমহীন হইয়া নিবীর্য হইয়া পড়ে। ইহার ফলে প্রচুর প্রাণীজ প্রোটিনভোজী দুর্ধর্ষ

বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব হয়। শক, হুন, পাঠান, মোগলের ভারত আক্রমণ ও ইহাদের রাজ্যস্থাপনের বিস্তৃত কাহিনী ত তোমরা ইতিহাসেই পড়িতেছ।

নানাকারণে বৌদ্ধধর্মের বন্ধন শিথিল হইলে শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মনীষীর প্রতিভা-প্রভাবে ভারতে হিন্দু ধর্মের যদি বা পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটিল কিন্তু উহা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে দেশে মৎস্য-মাংসাদির ব্যবহার আবার অনেকটা নিষিদ্ধ হইয়া পড়ায় জাতি নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ইহার পরেই শুরু হয় ইউরোপীয়গণের ভারত আক্রমণ ও শেষ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজের প্রভুত্বস্থাপন। এখন আমি কেবলমাত্র বাংলাদেশ সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিয়া উপসংহার করিতে চাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন বহিয়া গেলেও বাংলার শাক্তমত একেবারে লোপ পায় নাই; বরং বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শাক্তমত ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে এই সময়ে দুধ-মাছের যে অপ্রাচুর্য ছিল না তাহা বিজয়গুপ্ত, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙালী কবির কাব্য হইতে অনেকটা জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের কাব্যের—"অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা—ফুলচিনি, লুচি, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা। এবং তাঁহার অধ্যাত্ম-গানের—"দারাসুত পরিপাটি, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি।" প্রভৃতি পদ হইতে ঐ যুগে বাংলাদেশে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত

খাদ্যের যে কিরূপ প্রচলন ছিল তাহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তৎকালে প্রচলিত বহুবিধ মৎস্যের নাম ও নানা প্রকার রান্নার কথা আমরা দেখিতে পাই। নবাবী আমলে বিশেষভাবে শাক্তমতাবলম্বীদের মধ্যে মাংসেরও যে নানা প্রকার রান্না প্রচলিত ছিল—তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় এই কাব্য হইতে। তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল।ঃ—

কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল
শিকপোড়া ঝুরা কাঁঠালের বীজে ঝোল।
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই।
মায়া সোনাখড়কির ঝোল ভাজা সার
চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার।
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাত্‌লার মুড়া
তিতা দিয়া পচা মাছে রাঁধিলেক গুঁড়া।
আম্র দিয়া শোলমাছে ঝোল চড়চড়ী
আর রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী।
রুই কাৎলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।
বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা।

সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত
ঝালঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত।
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম।
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝোলঝাল রসা
কালিয়া দোলমা বাগা সেকটী সমসা।
অন্য মাংস শিকভাজা কাবাব করিয়া
রান্ধিলেক মুড়া আগে মশলা পূরিয়া।

পূর্ববাংলার নদীনালা, খালবিল চিরদিনই অফুরন্ত সুস্বাদু মাছের ভাণ্ডার। এখন হইতে পাঁচশত বৎসর আগে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী ফুল্লশ্রী গ্রামবাসী সুকবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে তৎকালে প্রচলিত বিবিধ প্রকারের মাছ, শাক, তরকারী, পরমান্ন ও পিষ্টকাদি রান্নার যে বিবরণ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা পড়িলে সত্যই মনে হয়—ঐরূপ আহার্য জুটিলে খাদ্য-বিজ্ঞান পড়ার দরকার করে না। আর পরবর্তীকালে ঐরূপ খাদ্যের বলে দৈহিক শক্তি ও মানসিক তেজে বলীয়ান বাঙালী সন্তানেরাই ত ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া বিদেশী বিতাড়নে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সেই সুজলা সুফলা পূর্ববাংলা আজ আর আমাদের নাই। ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে যে কতদূর মর্ম্মান্তিক ঘটনা—ইতিহাস অদূর ভবিষ্যতেই তাহার সাক্ষ্য দিবে। যাক তোমাদের উদগ্র কৌতূহল নিরসনের

জন্য বাহুল্য ভয়ে গুপ্ত কবির কাব্য হইতে কেবলমাত্র মৎস্য-রান্নার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল :—

"মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ।
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গীমা গাছ গাছ
ঝাঁঝ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ।
ভিতরে মরিচগুঁড়া বাহিরে জড়ায়ে সূতা
তৈলপাক করি রান্ধে চিংড়ির মাথা।
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।
দুই তিন আনাজ করিয়া ভাগ ভাগ
থোড় দিয়া ইচার মুণ্ড মূলা দিয়া শাক।
খান খান করিয়া কাটিয়া লইল চই
সাজ কটুতৈলে রান্ধে বাইন মৎস্যের খই ।
চেঙ মৎস্য দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বোল
কলার মূল দিয়া রান্ধে পিপুলিয়া শোল।
আনিয়া ইলিশ মৎস্য করিল ফালাফালা
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন দক্ষিণ সাগর কলা।
শোল মৎস্য কাটিয়া করিল খানখান
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আলু আর মান।
মাগুর মৎস্য আনিয়া কাটিয়া ফেলে ঝুড়ি
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আদা মাগুরী।"

আমাদের প্রোটিন-প্রধান খাদ্য কত বিচিত্র ও কত পুষ্টিকর ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তোমরা পাইলে। এ সব মাছের অনেকগুলির নামই হয়ত তোমরা শোনো নাই। চই, কলতা প্রভৃতি বস্তু কি তাহাও হয়ত কখনো দেখো নাই। তবু বাংলার এই খাদ্যসম্ভারের বিবরণে তোমরা উৎফুল্লই হইবে এবং বাঙালীর খাদ্য যে অন্য কোন জাতির খাদ্যের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল না, বরং সম্পূর্ণরূপে খাদ্যবিজ্ঞান সম্মত ছিল তাহাও বুঝিতে পারিবে। অতীতে আমাদের খাদ্যসম্ভারের যে কিরূপ বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য ছিল তাহা জানিয়া তোমরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে। তোমরা স্বতই মনে মনে বলিবে—"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। বর্তমানের শোচনীয় খাদ্য-পরিস্থিতি সকলের প্রাণেই আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে কোনো জাতিই টিকিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এবং খাদ্যবিষয়ক জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের দ্বারা আমরা অচিরেই এই মহা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারিব বলিয়া মনে হয়।

খাদ্য-নির্বাচনে শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাব

'বিভিন্ন যুগের খাদ্যের কথা' প্রসঙ্গে ভারতবাসীর খাদ্য-নির্বাচনে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ফলে আমিষ খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা যে জাতির মজ্জাগত সংস্কারে দাঁড়াইবে তাহাতে আর

বিচিত্র কি ? আর শরীরের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে আমিষ খাদ্য—তাহার সংগ্রাহক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্যতার জন্যও দায়ী বাঙালীর এই বৈষ্ণব মনোভাব।

আমরা দুইশত বৎসর ইংরেজের অধীনে থাকিয়া তাহাদের বাহ্যাড়ম্বর ও উপর-চালাকিই মাত্র অনুকরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের মনের উদারতা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণ গ্রহণ করিতে চেষ্টিত হই নাই। ইংরেজেরা কোনও ব্যবসায়কেই হীন মনে করে না—ইংলণ্ডে তাই অনেক 'ফিশারই' জ্ঞানবিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—জার্মানির এমিল এবং হান্‌স ফিশার ত নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াই চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। সমাজে হীন এবং অবজ্ঞাত থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ গৌরব অর্জন করিবার সুযোগ ঘটিত না নিশ্চয়ই।

যাহারা খাদ্যশস্য জন্মায় সেই মাহিষ্য, সদ্‌গোপ এবং উগ্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সম্প্রদায়কে এবং গোপালক গোপকুলকে বাঙালীসমাজ স্পৃশ্য পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতার কৃষ্ণ তিলক পরাইয়াছে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ললাটে—ফলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটে নাই এবং জাতীয় ব্যবসায় হীন মনে করায় তাহাদের অনেকেই নিজেদের পেশা ত্যাগ করিয়া মিলমজুরের দলপুষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এই মূঢ় মূক শ্রেণীর লোকই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাণ হারাইয়াছে। শেষ আঘাত হানিয়েছে দেশ বিভাগ এবং তৎসঙ্গে সূতা এবং কাঠের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা—যাহার দরুন জাল বা নৌকা তৈরি ও মেরামত করা হইয়া পড়িয়াছে

প্রায়—অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার মোটা মাহিনায় মৎস্যবিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া মৎস্যের চাষ বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু মৎস্য ধরিবার লোকের ও সাজসরঞ্জামের যে কি শোচনীয় অভাব ঘটিয়াছে—তাহা তাঁহারা তলাইয়া দেখিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

আমরা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'যত্র জীব তত্র শিব'—প্রভৃতি বাছা বাছা কতকগুলি বুলি পোষাপাখীর মত আওড়াইয়া থাকি, কিন্তু ঐ কথাগুলি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোনও দিনই প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে নাই। তাহা হইলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও স্পৃশ্য- অস্পৃশ্যতার মারাত্মক সমস্যায় বাঙালী সমাজ আজ এত বিব্রত হইত না। দেশবিভাগের বীজও যে আমাদের এই সংকীর্ণ মনোভাবের মধ্যেই অনেকটা নিহিত ছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিও যে বহুলাংশে দায়ী তাহাও স্বতঃস্বীকৃত। শিক্ষনীয় বিষয়ের চেয়ে শিক্ষকের জীবনবেদের উপরেই জাতির মঙ্গলামঙ্গল বেশী নির্ভর করে। বর্তমানে প্রকৃত প্রাণবন্ত শিক্ষক অতি অল্পই চোখে পড়ে। সমাজ এই শ্রেণীকে অনাহারে অবজ্ঞায় রাখিয়া তাহাদের প্রাণের উৎস শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে। "হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান"—এই বাক্য আমাদের শিক্ষকশ্রেণীর প্রতিই আজ বেশী প্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই বুভুক্ষু শিক্ষকশ্রেণীর দ্বারা জাতির চিন্তাধারা নব নব ভাবরসে, নিত্য নবীন কর্ম-প্রেরণায় পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাই জাতির জীবনে আজ এই চরম বিড়ম্বনা দেখা দিয়াছে।

এ বৎসর পয়লা জানুয়ারী সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে ইউটিলিবার্গ নামক তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের পাদদেশে শ্রীযুক্ত আমান নামক এক ভদ্রলোকের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করি। সুপ, স্যালাড, রুটি মাখনের পরে ডিম এবং মাংসের কুচি সংযোগে রান্না পোলাও এবং সর্বশেষে প্রচুর কমলালেবু দিয়া তিনি আপ্যায়িত করেন। আহারান্তে নানা বিষয়ের আলাপ করিতে করিতে আমানের অষ্টমবর্ষীয় পুত্রের পাঠ্য পুস্তকের একটি কবিতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। জুরিখের সাধুভাষা জার্মানের সঙ্গে ওদের কথ্য ভাষাও স্কুলে পড়ানো হয়। কবিতাটিতে ঐ দেশের গ্রামের পশুপাখী, প্রজাপতি, ফুলফল, লতাগুল্ম, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির ছবি ও তাহাদের বর্ণনা এবং গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর—গোপালক, হাঁসমুরগী পালক, কৃষক, ফল-ফুল উৎপাদক, তাঁতী, কাঠুরিয়া, কামার, ছুতার, জালিক, নাবিক প্রভৃতির প্রত্যেকের কাজের কথা এবং সেই কাজ শহরবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ প্রয়োজনীয় এবং সেজন্য গ্রামের ঐ সব লোকের কাছে ইহারা কিরূপ ঋণী তাহা সুন্দর সুন্দর ছড়ার আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে ছেলেবেলা হইতেই ওদেশের ছেলেমেয়েরা সমাজের সকল শ্রেণীর কাজই যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে পারিয়া সকলের প্রতিই সহানুভূতি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে শেখে। ফ্রাঙ্কফুর্টের নিকট বাডহোমবুর্গে পার্কস্যানাটোরিয়ম হোটেলে যখন ছিলাম তখন একদিন ট্যাক্সি চালক আমাকে হোটেলে আসিয়া পায় নাই। আমি ফিরিলে হোটেলের কর্তৃপক্ষ বলিলেন—"ট্যাক্সি

চালক জেণ্টলম্যান আসিয়া আপনার খোঁজ করিয়াছিলেন।” বুঝিলাম এরা ট্যাক্সিচালককেও ছোট মনে করে না—তারাও জেণ্টলম্যান বা ভদ্রলোক। ফলতঃ কোনও কাজই যে ছোট নয়—তাহা অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারিলে আপনা হইতেই মনে উদারতার উৎপত্তি হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য কত অসংখ্য লোক যে প্রতিনিয়ত কর্মরত রহিয়াছে তাহা নিম্নের উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিবে। এইমাত্র তুমি যে খাদ্য খাইলে ইহা কত লোকের পরিশ্রমের ফলে ঘটিল তাহা কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি ?—যে ভাত খাইলে, সেই চাল তৈরি হইয়াছে ধান হইতে চাউলকলে—সেখানে কত লোক খাটিতেছে। ধান উৎপন্ন করিয়াছে কৃষক—বর্ষারম্ভে কাদাজলের মধ্যে জমি চাষ দিয়া ও জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ধান-চারা রোপন করিয়া এবং হেমন্তকালে ঐ ধানগাছ কাটিয়া মাথায় করিয়া খোলায় আনিয়া মাড়াই বা ঝাড়াই করিয়া সে উহা বাড়িতে সযত্নে রাখিয়াছে। যে মাছ খাইলে উহার জন্য মৎস্য-জীবী হাঙর কুমীরের ভয় না করিয়া, নদীর প্রকাণ্ড ঢেউ ও পাক অগ্রাহ্য করিয়া সারারাত্রি না ঘুমাইয়া মাছ ধরিয়াছে। বেচারার হয়ত তোমাদের মত ছেলেমেয়েরা রহিয়াছে কোন্ দূর গ্রামে—আম গাছের ছায়ায়, ভাঙা কুটিরে। যে দুধ খাইলে উহার জন্য কত সর্পসঙ্কুল মাঠে রাখাল বালক গরু চরাইতেছে। সমুদ্রতীরে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া দলে দলে লোক তোমারই পাতের লবণ তৈরি করিতেছে। কত সাপ, বাঘ, হাতী প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী রহিয়াছে বনে—সেই বন হইতে লোকেরা

তোমাদেরই রান্নার জন্য তেজপাতা, দারুচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা সংগ্রহ করিতেছে। চিনি, শাক-সবজি, ডাল, তেল, হলুদ, লঙ্কা জিরা, মৌরী, কালোজিরা, এলাচি প্রভৃতির উৎপাদনেই না কত লোক সর্বদা খাটিতেছে। সুতরাং বুঝিতেছ, তোমাদের একমাত্র খাদ্যের জন্যই কতলোক দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। জুতা, ছাতা, কাপড় চোপড়ের জন্য আবার কত অসংখ্য লোক খাটিতেছে তাহা চিন্তা করিলে গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়; সুতরাং এই সকল লোকের প্রতি সর্বদা যে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ভাব প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ।

মাছ-মাংস, হাঁস মুরগির ডিমের কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করায় কেহ কেহ মনে করিতে পারেন আমি আমিষ খাদ্যের প্রতি বড় বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছি। কিন্তু কেন যে আমি প্রাণীজ আমিষ খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি প্রোটিন ও অন্যান্য অধ্যায়ে তাহার কারণ দেখানো হইয়াছে। দুধ পর্যাপ্ত পরিমানে পাইলে মাছমাংস না হইলেও চলিতে পারে; কিন্তু বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহাতে মাছ বা ডিম না খাইলে শরীর রক্ষার উপায়ান্তর নাই। ইহা খাদ্যবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কথা।

বিদেশী সরকার আমাদের মনের বল শিথিল করিবার জন্য ইতিহাসকে যেরূপ বিকৃত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন—খাদ্যসম্বন্ধেও সেইরূপ অর্ধসত্যের জয়গান করিয়া আমাদিগকে নিবীর্য করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গরম দেশে কাজ করা যায় না—গরম দেশে মাংসডিম্বাদি সহ্য হয় না বলিয়া স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও উহা সন্নিবেশ করিয়া জাতির জীবনধারায় তাঁহারা মৃদুবিষ সঞ্চার করিতে ছাড়েন নাই। পাঞ্জাব গ্রীষ্মকালে বাংলার চেয়ে কম গরম নয় কিন্তু সেখানকার লোকেরা অসম্ভব মাংসাশী বলিয়াই ত জানি। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাও ত শীতপ্রধান স্থান বলিয়া ভূগোলে বলে না—তথাপি সে সব দেশের শ্বেতাঙ্গগণ হবিষ্যান্ন খাইয়া দিন কাটায় বলিয়াও ত শুনি নাই। কেবল ভারত তথা বাঙ্গালা দেশের লোকদের নিরামিষাশী করিবার জন্য বিদেশী সরকারের এত মাথা ব্যথা ছিল কেন? ইহাও জানা কথা যে যখনই কোনও সংঘ ধর্মের খোলস পরিয়া বাঙালীকে মৎস্য মাংস পরিহারের পরিকল্পনা দ্বারা জাতিকে ক্লীবত্বকূপে নিমজ্জিত করিবার প্রয়াসী হইতেন তখন স্বয়ং লাট সাহেব পর্যন্ত আশ্রমে পদার্পণ পূর্বক ঐ কার্যে উৎসাহ দিতেন। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি বিখ্যাত গানের পদ ভুল করিয়া আমার এক বন্ধু গাহিতেন —"মানুষ নহিত আমরা মেষ"। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি বন্ধু ঠিকই গাহিতেন; কারণ রূঢ় সত্যকে অবলম্বন করিয়া, যুক্তিতর্ক দ্বারা চলিতে আমরা বড় একটা চাই না, আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে চলিবারই বেশী পক্ষপাতী। তাই ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রদর্শিত বিবেকের পথে, যুক্তিতর্কের দ্বারা আলোকিত পথে চলিতে আমরা স্বতই দ্বিধা বোধ করি। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে এই সব মনীষীর নির্দিষ্ট পথে চলা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না—জাতি বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

খাদ্যনির্বাচনে সংস্কার কিরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহা প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করিতেছি। আমার একজন বন্ধুর বাড়িতে পুকুর থাকিতেও তিনি হাঁস পুষিতে বা ডিম খাইতে পারেন না—তাঁহার সংস্কারে বাধে। মাছ অগ্নিমূল্য, আর মাছের ত চৌদ্দ আনাই জল আর কাঁটা, মাংস সে তুলনায় বরং সস্তা। কিন্তু ঐ বন্ধু বাড়িতে যে মাংস আনিয়া খাইবেন তাহারও উপায় নাই। অথচ পুষ্টির অভাবে দিন দিন তিনি শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতেছেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরাও শরীর ও মনে পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে—গৃহ ব্যাধি-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে পারিলে উঁহাকে যে এতটা দুরবস্থায় পড়িতে হইত না—তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ কত বাঙালী পরিবার যে সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আজ শুধু সংস্কারের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক স্থলে গৃহস্বামীর এসব বালাই না থাকিলেও গৃহিণীর মন সংস্কারমুক্ত না হওয়ায় সমুদয় পরিবারকেই উল্লিখিত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই জন্য সর্বাগ্রে ছেলেমেয়ে সকলেরই মন তৈরি করা দরকার। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেই জাতির মন তৈরি হইবে। তার আগে নয়। যে শিক্ষা আমাদের বাঁচার পথ দেখাইতে না পারে সে শিক্ষায় লাভ কি ? স্থানকাল-

পাত্রের ভেদাভেদ বুঝিবার জ্ঞান ও তাহা কার্যে পরিণত করিবার মত মানসিক শক্তি জাগাইতে ও বিকশিত করিতে পারে যে শিক্ষা—এখন আমাদের সেই শিক্ষার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। শরীর ও মনের অদম্য বলে বলীয়ান শিক্ষাব্রতীও এজন্য সমভাবে অপরিহার্য।—আর এই শিক্ষক সম্প্রদায়কে খাদ্য-বিজ্ঞানসম্মত আহার্যে পুষ্ট ও তেজোদৃপ্ত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব লইতে হইবে সমাজকে—জাতীয় সরকারকে। অন্যথা এ জাতির আসন্ন ধ্বংস কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্যের সংস্থান

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের লোকেরা এখন শহর থেকে দূরে পল্লীতে বাস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। শহরে বহু-লোকের একত্রে বাসজনিত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যতীত ভবিষ্যৎ সর্বধ্বংসী যুদ্ধে আনবিক বোমা ব্যবহৃত হইতে পারে সেই আশঙ্কাতেও পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা শহর ছাড়িয়া গ্রামে বাস করিবারই বেশী পক্ষপাতী। আমি হামবুর্গ, লণ্ডন প্রভৃতি শহরে অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা শহরতলী হইতে প্রত্যহ আসিয়া অফিসের কাজ করেন। অবশ্য এদের পল্লীগ্রামে যাতায়া-তের যারপরনাই সুবিধা। পল্লীতে জলা, ডোবা, মশামাছি, সাপ-বাঘেরও উপদ্রব নাই। বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রামেও সরবরাহ

হয় কাজেই শহরের সমুদয় সুবিধাই গ্রামে আছে। তদ্ভিন্ন শহরে যাহা নাই—প্রকৃতির অজস্র দান—মুক্ত আলোবাতাস, পল্লীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষিত লোকেদেরও বাড়ির সংলগ্ন জমিতে হাঁস মুরগী ও গরু ভেড়া পালিবার ব্যবস্থা আছে। তরিতরকারি শাক-সব্জি, আপেলাদি ফলও তাঁহারা নিজ হাতেই জন্মানোতে খাদ্যসমস্যা তাঁহাদের অনেকটা সমাধান হইয়াছে। আগামীকালে আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিলে চলিবে না। ক্রমশঃ শহরগুলি লোকের চাপে যেরূপ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে শীঘ্রই বাংলার পল্লী উন্নয়ন পূর্বক শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী লোকেরা শহর ছাড়িয়া না গেলে উপায় নাই। যাতায়াতের সুবিধা ছাড়া গ্রামগুলির জল ডোবা ভরাট করাইয়া মশামাছি বিদূরীত করিয়া গ্রামেও আধুনিক সভ্যতার সকল প্রকার উপকরণের ব্যবস্থা হইলে অতিশয় শৌখিন লোকেরাও শহর ছাড়িয়া গ্রামে বসবাসের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে। বিত্তবান লোকেরা গ্রামে দীঘি খনন করাইয়া স্কুল কলেজ হাসপাতাল আদর্শ কৃষিবিদ্যালয়, গরু, হাঁস, মুরগী, মাছ প্রভৃতির বিজ্ঞানসম্মত চাষের প্রবর্তন করিলে গ্রামেই তখন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। বর্তমানের দারুণ খাদ্যাভাব কোমলমতি তোমাদেরও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে নিশ্চয়ই। সুতরাং তোমাদের সকলেরই মন এখন এমন বাড়ির দিকে গিয়াছে—যে বাড়ির বাগানে নানাপ্রকারের ফলমূল, যার পুকুরের জলে প্রচুর মাছ—যেখানে তোমরা সাঁতার কাটিতে ও মনের সুখে স্নান করিতে পার—

যে বাড়িতে হাঁস পুষিয়া ও গরু পালন করিয়া টাটকা দুধ ও ডিম খাইতে পার। যে বাড়ির সামনে তোমরা গোলাপ, টগর, চন্দ্রমল্লিকা রজনীগন্ধা, হেনা, দোলনচাঁপা প্রভৃতি ফুলের চারা বসাইয়া ফুল ধরিলে তাহার গন্ধ ও সৌন্দর্যে আনন্দ পাইতে পার। জার্মানি সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বড় বড় অধ্যাপকরা পর্যন্ত নিজ হাতে কোদালি চালাইয়া জমিতে ফুল ও ফলের চাষ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। আর আমাদের দেশে যে কোনও প্রকারের শারীরিক পরিশ্রমের কাজকেই শিক্ষিত লোকেরা হীন মনে করায় যাহারা হাতের কাজ করিয়া সমাজের ভার বহন করিতেছে, তাহারা নিজেদের সর্বদা হেয় মনে করে এবং সুযোগ পাইয়া শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হইলে ইহাদের ছেলেরাও শেষে বাবু হইয়া বসে; ফলতঃ এইভাবে দেশের উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। একজন দৈবক্রমে হয়ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছে। অবস্থাহীন হইলে সে সামান্য দোকান করিবে তবু বাড়িসংলগ্ন পতিত জমিতে চাষ দিয়া দুমুঠো ফসল ফলাইবে না। জাত্যাভিমান যে দেশে এত প্রবল সে দেশে শিক্ষার আমূল সংস্কার না করিলে দেশ কখনও খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে না। শহরে ভিড় না করিয়া যদি শহরতলী ও পল্লীগ্রামের সংস্কার ও উন্নয়ন করা যায় তবে অধিকাংশ লোকেই আবশ্যক খাদ্যের অনেকটা নিজেরা ফলাইতে পারিলে খাদ্যসমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে। মানুষের মস্তিষ্ক ও হাত সমভাবে

ক্ষিপ্রতার সহিত কার্যক্ষম হইয়া না উঠিলে সম্মুখে যে দিন আসিতেছে তাহাতে টিকিয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 'মাটির মায়ার' কবি এরূপ পল্লীগৃহেরই বর্ণনা দিয়াছেন। তোমরা জানিলে খুসী হইবে আশায়—কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইলঃ—

গরমের কালে লিচু আম জাম জামরুল থরে থরে
বেল পেঁপে লেবু কলা আনারস আমার বাগানে ধরে।
পুকুরের পাড়ে নারিকেল শ্রেণী বহে শিরে বারমাস
লিমনেড জিনি সুপেয় পানীয় কত সুমিষ্ট শাঁস।
বেগুন লঙ্কা পালং টম্যাটো কপি আলু করি চাষ
মাঝে মাঝে ঘরে ডিম পাড়ে মোর সুপুষ্ট পাতিহাঁস।
বরবটি লাউ পুঁই ঝিঙা শশা কুমড়া মাচায় ফলে
লক্ষ্মীর বাস আমার আবাসে তাইত সকলে বলে।
পুকুরে আমার ফটিকের মত জল বারমাস থাকে
কাতলা রোহিত মৃগেল মৎস্য খেলা করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ফেন ভুষি খেয়ে নধর কান্তি আমার শ্যামলী গাই
তাইত জগতে তাহার দুধের তুলনা কোথাও নাই।

পল্লীগৃহের এইরূপ ছবি তোমাদের মনে উজ্জ্বল হইয়া থাকিলে একদিন না একদিন এরূপ বাড়ির অধিকারী হইবার আগ্রহও তোমাদের মনে বদ্ধমূল হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ বসতবাটি থাকিলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অনেকটা মিটিতে পারে, ফলে শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ করাও সহজসাধ্য হয়।

পরিশিষ্ট

খাদ্য সম্বন্ধে পূর্বে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করার পর খাদ্যের উপযোগিতা যে মানদণ্ডে নির্ণীত হয়, তাহার আলোচনা করিয়া বিভিন্ন বয়সে আমাদের কোন্ কোন্ সহজলভ্য খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক, তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

খাদ্যের উপযোগিতা বা খাদ্যমান সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে খাদ্যের উপাদান এবং বিভিন্ন খাদ্য কি ভাবে শরীরে ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক। খাদ্যোপাদান-গুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত :—যথা—কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করা ও শ্বেতসার, ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ, প্রোটিন বা আমিষপদার্থ, ভিটামিন, লবণপদার্থ ও জল। ইহাদের মধ্যে শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে প্রথমোক্ত তিনটি উপাদান—যদিও প্রোটিনের অন্যতম কাজ হইতেছে লবণ পদার্থের মতই গঠনমূলক। আমরা সচরাচর যে সব খাদ্য খাই, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই খাদ্যের একাধিক উপাদান বিদ্যমান থাকে। ডালের মধ্যে যদিও কেবলমাত্র মসুর ডালকেই সচরাচর আমিষ বলিয়া মনে করা হয়, তথাপি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নির্ণীত হইয়াছে যে, সকল প্রকার ডালেই শতকরা প্রায় ২৫ অংশ আমিষ পদার্থ বিদ্যমান। এমন কি চাল, আটা, গোলআলুর

মধ্যেও যথাক্রমে শতকরা সাড়ে ছয়, সাড়ে তের ও দুই ভাগ আমিষ পদার্থ থাকে। চাল, আটা ও ডালের অবশিষ্ট সবটুকুই প্রায় কার্বোহাইড্রেট। গোলআলুর ত শতকরা প্রায় আশি ভাগই জল। সুতরাং ২ ভাগ আমিষপদার্থ বাদে উহার অবশিষ্ট প্রায় সবটাই কার্বোহাইড্রেট। স্বভাবজাত কোনও খাদ্যদ্রব্যেই মানুষের শরীররক্ষার উপযোগী সমুদয় খাদ্যোপাদান থাকে না। এ বিষয়ে দুধই একমাত্র ব্যতিক্রম। দুধে শর্করা, আমিষ, স্নেহ ও লবণ পদার্থ ছাড়া কয়েকটি ভিটামিন এবং জল—সবই বিদ্যমান ; তবে পরিণত বয়স্কলোকের পক্ষে ঐ খাদ্যোপাদানগুলি যে অনুপাতে আবশ্যক, দুধে সেই, পরিমাণে না থাকায় এবং অনেকগুলি ভিটামিন ও লবণ পদার্থের অভাব নিবন্ধন, শুধু দুধ পান করিয়া বয়স্ক মানুষ বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। খাদ্যের উপাদানগুলির বিষয় জানিবার পর তাপ ও শক্তিসরবরাহকারী উপাদানগুলির কার্যকারিতা ও শরীররক্ষায় তাহাদের উপযোগিতার বিষয় বলা হইতেছে।

তাপ ও শক্তির একটিকে যে অপরটিতে রূপান্তরিত করা যায়, সে কথা অনেকেরই জানা আছে। হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে শক্তি তাপরূপে প্রকাশ পায়। তাপের দ্বারা শক্তি উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—কয়লার তাপে জলকে বাষ্প করিয়া তদ্দারা রেলগাড়ী প্রভৃতি চালানো। তাপের পরিমাণ যে 'মানে' মাপা হয় তাহাকে ক্যালোরি বলে।

পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—

তীব্রতা নিরূপিত হইয়া থাকে। তাপের পরিমাণ মাপা হয় ক্যালোরিতে। তোমরা আগেই শিখিয়াছ, ১ হাজার গ্রামকে বলে ১ কিলোগ্রাম। এক কিলোগ্রামকে মোটামুটি আমাদের ১ সের ধরা যায়। মনে কর, একটি পাত্রে ১ কিলোগ্রাম বা একসের জল আছে। সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার দিয়া দেখিলে ঐ জলের তাপ ২০° ডিগ্রী। এর পর ঐ জলে তাপ দিতে বা গরম করিতে আরম্ভ করিলে। যখন থার্মোমিটারে ২১° ডিগ্রী উঠিল, তখন বুঝিবে ঐ জল অনেকটা তাপ গ্রহণ করিয়াছে। যে পরিমাণ তাপে ১ কিলোগ্রাম জল ২০° হইতে ২১°তে উঠিল, সেই পরিমাণ তাপকে বলা হয় ১ কিলো-ক্যালোরি। সংক্ষেপে উহাই এই পুস্তকে ক্যালোরি বলিয়া লিখিত হইল।

১ গ্রাম প্রোটিন পুড়াইলে ৪·১ ক্যালোরি তাপ পাওয়া যায় বলিলে এখন তোমাদের আর উহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না নিশ্চয়ই।

চিনি পুড়িয়া গেল, কথাটির তাৎপর্য এই যে, চিনির অণুতে যে কার্বন থাকে, তাহা বাতাসের অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক সম্মিলনে কার্বনডাইঅকসাইড নামক গ্যাসে এবং চিনির অণুর মধ্যে যে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, সেগুলি অনুরূপ রাসায়নিক সম্মিলনে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় এবং যখন এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, তখন অনেকটা তাপ নির্গত হইয়া থাকে। ঘি, চিনি প্রভৃতি খাদ্যবস্তু যখন আমরা আহার করি, তখন সেগুলি পরিপাকযন্ত্রের বিভিন্নরসের ক্রিয়াতে নূতন নূতন ক্ষুদ্রাকার পদার্থে পরিণত হয় এবং এগুলি রক্তস্রোতে প্রবেশ

করিলে রক্তের লোহিত কণিকাবাহিত অক্সিজেন গ্যাসের সংস্পর্শে তাহারা কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ নির্গত হয়। রক্তস্রোতে বিভিন্ন এনজাইম ও অন্যবিধ পদার্থের সহযোগিতায় এই মৃদু দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দুর্জ্ঞেয় এই প্রক্রিয়া জীব জগৎকে সচল রাখিয়াছে। এ যেন বিনা আগুনে দহন ক্রিয়া। বলা বাহুল্য, বাহিরে পোড়াইলে বা শরীরের মধ্যে রূপান্তরিত হইলে সমপরিমাণ পদার্থ হইতে ঠিক সমান পরিমাণ তাপই পাওয়া যায়।

ডাঃ কালিপদ বসু মহাশয় আমাদের পরিচিত অনেকগুলি খাদ্যদ্রব্যের ১০০ গ্রামে (৯ তোলায়) কত ক্যালোরি দিতে পারে তাহা স্থির করিয়াছেন। নিম্নে তালিকাটি দেওয়া হইল।

১০০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য	ক্যালোরি	১০০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য	ক্যালোরি।
চাউল (আমন)	৪১৫	ছোলা ডাল	৩৭৬
„ (আউশ)	৩৫৭	মাষকলাই”	৩৪৫
মুড়ি	৩২০	অরহর ”	৩২৮
খই	৩৪৪	ওলকপি	১৪
চিড়া	২৯৫	ফুলকপি	২৫
ময়দা	৩৬০	বীট	২৬
আটা	৩০৭	শিম	২৪
সুজি	৩২৫	করলা	১৬
বার্লি	৩৫০	পালংশাক	১৬

১	গ্রাম	প্রোটিন	পুড়িলে	৪·১ ক্যালোরি	তাপ	জন্মায়
১	„	স্নেহপদার্থ	„	৯·৩ „	„	„
১	„	কার্বোহাইড্রেট	„	৪·১ „	„	„

ক্যালোরি সম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। আমাদের ঘরে ঘরে জ্বর দেখিবার জন্য যে থার্মোমিটার থাকে উহা ফারেনহাইট থার্মোমিটার। অপর যে প্রকারের তাপমান যন্ত্র বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাকে বলে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার। উভয় প্রকার থার্মোমিটারেরই উদ্দেশ্য এক, তবে উহাদের মাপের মধ্যে শুধু পার্থক্য। একটি লাঠি হাত দিয়া (১৮ ইঞ্চিতে ১ হাত) মাপিলে ৩ হাত হয়, কিন্তু ফুটরুল দিয়া মাপিলে উহাকেই আমরা বলি সাড়ে চার ফুট। ইহাতে লাঠির দৈর্ঘ্যের কোনও পরিবর্তনই হয় না জান। সেইরূপ বিশুদ্ধ জল যে তাপে বাষ্পে পরিণত হয় তাহাকে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারে ১০০° ও ফারেনহাইট থার্মোমিটারে তাহাকে বলা হয় ২১২° ডিগ্রী। আবার বিশুদ্ধ জল যে শৈত্যে বরফে পরিণত হয় উহাকে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারে ০° এবং ফারেনহাইট থার্মোমিটারে ৩২° ডিগ্রী ধরা হয়।

কোনও একপ্রকার থার্মোমিটারে তাপের বিষয় জানিলে উহা অন্য প্রকার থার্মোমিটারে কত ডিগ্রী হইবে তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা যায়।

মনে কর, একজনের ১০৪° ডিগ্রী জ্বর হইয়াছে। পূর্বেই বলিলাম, ইহা ফারেনহাইট থার্মোমিটারে দেখা হয়। এখন

উহা সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারে কত ডিগ্রী হইবে তাহা নিম্নলিখিত ভাবে অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে পার—

$(১০৪ - ৩২) \times {}^{৫} = \frac{৭২ \times ৫}{৯} = ৪০^{\circ}$ ডিগ্রী।

পক্ষান্তরে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারের ৩৫° ডিগ্রী ফারেনহাইটে হইবে—

$৩৫ \times \frac{৯}{৫} + ৩২ = ৯৫^{\circ}$ ডিগ্রী।

তোমরা বড় হইলে থার্মামিটার কিভাবে তৈরি হয়, উহা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কিরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহাও জানিতে পারিবে। তাপের তীব্রতা এবং তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা থাকা দরকার। আগে একটি সহজ উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। আধসের জল লইয়া একটি গেলাসে ঢালিলে দেখিবে তলা হইতে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে জল উঠিয়াছে; কিন্তু সেই জল একটি বাটিতে ঢালিলে দেখিবে বাটির তলা হইতে উহা হয়ত ২ ইঞ্চি মাত্র উপরে উঠিয়াছে। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই জলের পরিমাণ একই রহিয়াছে। সেইরূপ একটি জ্বলন্ত উননে চায়ের কেটলি রাখিলে ৫ মিনিটের মধ্যেই উহার জল ফুটিতে থাকিবে অথচ সেই উননের উপর ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া পাঁচ মিনিট রাখিলে দেখিবে জলে হাত দিলেও কষ্ট হইবে না—অর্থাৎ চায়ের কেটলির জল যে পরিমাণ তাপে ১০০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছিয়াছে, ভাতের হাঁড়ির জল সেই পরিমাণ তাপে ৩৫°–৪০° ডিগ্রীর বেশী ওঠে নাই।

ইহা হইতে তোমরা বুঝিতেছ, থার্মোমিটারের মাপে তাপের আসল পরিমাণ বা quantity বুঝায় না উহাতে শুধু তাপের

সমপরিমাণ খাদ্য কয়েকজন সমবয়সী ব্যক্তিকে খাওয়াইলেই যে তাহাতে সমান পরিমাণ তাপ তথা শক্তি উৎপন্ন হইবে, একথাও বলা যায় না। যাহার পরিপাক শক্তি যত প্রখর, তাহার রক্ত-স্রোতে ঐ খাদ্যের জীর্ণ অংশ তত বেশী পরিমাণে যাইবে, কাজেই সে ঐ খাদ্য হইতে তত বেশী শক্তি আহরণ করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অপর ব্যক্তির চেয়ে সে অধিকতর শক্তিমান ও কর্মক্ষম হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী এবং পুরুষের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কত ক্যালোরি শক্তি খরচ হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের পরিশ্রমের দরুনই বা ক্যালোরি শক্তির ব্যয় কি পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, নিষ্কর্মা অবস্থায় আবার শক্তি খরচ হইবে কেন? তাহার উত্তরে বলা যায়, মানুষ যখন চুপচাপ বসিয়া থাকে, তখনও তাহার ফুসফুস প্রতিনিয়ত বাতাস গ্রহণ ও বর্জন করিতেছে, হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করিয়া সারা শরীরে সঞ্চালিত করিতেছে, পরিপাক-শক্তি সক্রিয় রহিয়াছে, মস্তিষ্ক চিন্তা করিতেছে—এইরূপ বিভিন্ন শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া পরিচালনায় ও শরীরের তাপরক্ষায় শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, খাদ্যোপাদানগুলি শরীরে দগ্ধ হইয়া এই তাপ জন্মে এবং কোন্ প্রকার খাদ্যে কত ক্যালোরি তাপ দিতে পারে, তাহাও নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং যখন বুঝিতে পারি রাম বা রহিমের দৈনিক দুই হাজার ক্যালোরি দরকার, তখন তাহার দৈনিক কতটা চাল, ডাল, তেল ইত্যাদির প্রয়োজন তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা যায়। নিম্নে বয়সভেদে ক্যালোরির চাহিদার বিষয় লিখিত হইল ঃ—

১৩ বৎসরের বেশী বয়সের পুরুষের যদি ১০০ ক্যালোরি
ধরি—তবে ,, ,, স্ত্রীলোকের লাগে ৮৩ ,,
,, নিম্নতম বালকবালিকাদের ,, ৭০ ,,
৬ ,, ,, শিশুদের ,, ৫০ ,,

অবশ্য শারীরিক পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে বয়স্ক লোকের যে ১০০ ধরা হইয়াছে তাহার স্থলে ১২৫, ১৫০ এবং কঠিন পরিশ্রমকারীর পক্ষে দুইশত বা ততোধিক ক্যালোরি দরকার হইয়া থাকে। একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, বেশী শারীরিক পরিশ্রমে আমিষ পদার্থের পরিমাণ না বাড়াইয়া শুধু কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থের পরিমাণ বাড়াইয়া ক্যালোরি পোষাইয়া লইলেই চলে। তদ্ভিন্ন যাঁহার শরীরের ওজন যত বেশী, তাঁহার তত বেশী ক্যালোরি এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা বেশী ক্যালোরি আবশ্যক হয়। বয়স্কদের মধ্যে যাঁহারা স্বল্পশ্রম করেন, তাঁহাদের দুই হাজার আড়াই হাজার ক্যালোরি, মাঝারি রকমের শারীরিক শ্রমে দৈনিক ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার ক্যালোরির জোগান দেওয়া আবশ্যক। শরীরের ওজন জানা থাকিলে স্বল্পশ্রমে ঐ লোকের দৈনিক কত ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য দরকার তাহা হিসাব করিয়া বলা যায়। মনে কর, যার ওজন ৪০ সের তার দৈনিক লাগিবে—৪০ × ৩৫ = ১৪০০ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য। অবশ্য পরিশ্রমের অনুপাতে যে উহা বৃদ্ধি পাইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্রমের অনুপাতে খাদ্যে বেশী ক্যালোরি না উঠিলে শরীর ভাঙিয়া যায়, কর্মক্ষমতা

১০০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য	ক্যালোরি	১০০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য	ক্যালোরি
এরারুট	৩৫০	পেঁয়াজ	৫০
সাগু	৩৩৪	নটে ডাঁটা	৯
যবের ছাতু	৩৩০	শাঁখআলু	২৭
মসুর ডাল	৩৬২	খেজুর	২৮৯
খেসারি "	৩২৮	কিসমিস	২৭৪
পাটনাই মটর"	২৮৫	আপেল	৫১
দেশী মটর "	৩০৫	ন্যাশপাতি	৫০
মুগ "	৩৬৩	বাদাম	৬৩৭
কাঁচাকলা	১৫	নারিকেল	৩৬৩
কাঁচাপেঁপে	১৬	বাঙ্গি	৬
শশা	৫	বেল	১২২
বেগুন	২০	পাকা কলা	১১৩
গোলআলু	৬৪	ডিমের শেতাংশ	৭২
মিষ্টিকুমড়া	১৮	,, কুসুম	৩৯৬
মূলা	১১	শুষ্কদুগ্ধ	৪৯০
মিষ্টিআলু	১১০	ছানা	২৩৫

এইমাত্র উল্লেখ করা হইল যে, খাদ্যোপাদানগুলি পরিপাকান্তে ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শ্বেতসার ও শর্করা (রুটি ভাত চিনি প্রভৃতি) হইতে যে রূপান্তরিত নূতন পদার্থ জন্মে, তার নাম গ্লকোজ। আমিষ পদার্থ হইতে পাওয়া যায় বিভিন্ন অ্যামিনো

অ্যাসিড এবং স্নেহপদার্থের পরিণতি হইতেছে গ্লিসারিন ও কয়েকপ্রকার জৈব অ্যাসিডে। গ্লুকোজ, গ্লিসারিন ও জৈব অ্যাসিড পূর্বোক্তভাবে দগ্ধ হইয়া শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে, কিন্তু প্রোটিনজাত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি প্রধানতঃ নূতন মাংসপেশীর গঠন ও ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন পেশীগুলির ক্ষতিপূরণ করে এবং আবশ্যক অতিরিক্ত অংশ গ্লুকোজের মতই শক্তি উৎপাদন করে। এই কারণে মাছমাংস বেশী পরিমাণে খাইয়া পরিপাক করিতে পারিলে, তাহাতে অনেকটা ভাত রুটি খাওয়ার মত কাজই হইতে পারে। প্রোটিনের অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে শরীরের চাহিদা মত অ্যামিনো অ্যাসিড যদি খাদ্য হইতে না পাওয়া যায়, তবে শরীরের মাংস-পেশী ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া অপরিহার্য শারীরিক ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই শোচনীয় অবস্থা শরীরে ভাঙ্গন ধরারই নামান্তর।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শরীরের মধ্যেও যখন দহন ক্রিয়াই চলিতেছে, তখন ভাতের বদলে কয়লা বা পেট্রোলে ঐ কাজ চলিতে পারে কি না। এ কথার উত্তর এই, শরীরের যন্ত্রাদির গঠন এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, কয়েকটি বিশেষ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু ধমনীর রক্তস্রোতে প্রবেশ করিতে বা দগ্ধ হইতে পারে না। কয়লা যত গুঁড়া করিয়াই খাওয়া যাউক, উহা হজম হইবে না, কাজেই রক্তস্রোতে পৌঁছিতে পারিবে না।—পেট্রোলের বেলাতেও ঐরূপ অবস্থা। এতদ্‌ভিন্ন কত জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত পদার্থের সংযোগ ও সহযোগিতায় এই দহনকার্য চলে যে, তাহার প্রকৃত রহস্য এখনও পুরাপুরি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। পক্ষান্তরে

সাধারণ ভারত বাসীর দৈনিক খাদ্য তালিকা কিরূপ হইতে পারে*

খাদ্য	পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য	কিলো ক্যালোরী	মন্তব্য
চাল	৩ ছটাক	৬ পয়সা	৭০০	যাঁহারা ডাল সহজে পরিপাক করিতে পারেন, তাঁহারা দিনে এক ছটাকের পরিবর্তে দুই ছটাক ডালও খাইতে পারেন।
ডাল	১ ”	৪ ”	২৪০	
গম	৩ ”	৬ ”	৭০০	
তরকারি (পালং শাক, পুই শাক, বাঁধাকপি, লাউ, কুমড়া. মিঠে ও সাদা আলু প্রভৃতি)	৬ ”	৬ ”	৪০০	
তেল	½ ”	৪ ”	২৬০	
গুড়	১ ”	২ ”	২০০	
		২৮ ” বা ।৵০ আ	২৫০০	
ইহার পরেও যদি সম্ভবপর হয়ঃ				
ডিম	১ টা	৮ পয়সা	১২০	
দুধ বা দৈ	১ পোয়া	১৬ ”	১৮০	
		৫২ ” বা ৸৵০ আ	২৮০০	

ইহা ব্যতীত লবণ ও মসলার জন্য অতিরিক্ত ২॥০ হইতে ৫ পয়সা বরাদ্দ ধরা যাইতে পারে।

*ডক্টর নীলরতন ধর মহোদয়ের সদ্য প্রকাশিত খাদ্যসম্বন্ধীয় পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আয় কমিয়া যায় এবং ব্যাধি ও দারিদ্র্য চিরসহচর হইয়া পড়ে।

যদিও শারীরিক অবস্থা এবং পরিশ্রমের কমবেশীর দরুন প্রত্যহ আমাদের সমানভাবে তীব্র ক্ষুধা পায় না বা প্রত্যেক দিনই সমপরিমাণ খাদ্য আমরা আহার করিতে পারি না, তথাপি বিভিন্ন বয়সে কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে আহার করিলে ক্যালোরি পূরণ হয় এবং শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা বজায় থাকে, তাহারই কয়েকটি তালিকা দেওয়া হইল। অবশ্য চাল, ডাল, তেল প্রভৃতির দরুন যে ক্যালোরি লিখিত হইল, বাস্তব পক্ষে ঐ সব পদার্থের ভেজালের জন্য ক্যালোরি কিছু কম পাওয়া যাইবে।

দৈনন্দিন ব্যবহারের যে খাদ্যতালিকা দেওয়া হইল, বর্তমান দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতার দিনে উহা হুবহু মানিয়া আহার্য সংগ্রহ করা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও সুকঠিন। তবে তালিকা প্রদত্ত খাদ্য শরীরের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি ও সুস্থতা বিধানের জন্য বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রত্যেকই উহা দেখিয়া নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে আহার্য নির্বাচন করিলে, নিজেদের এবং ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন বলিয়া মনে করি। অবশ্য যেখানে আটা তিন ছটাক ও চাউল তিন ছটাক ধরা হইয়াছে, সেখানে রুচি ও শক্তি অনুযায়ী উহার যে কোনও একটি একুনে ছয় ছটাক ধরিলেই চলিবে। ১টি ডিমের পরিবর্তে ½ছটাক মাছ, মাংস বা ছানা ধরা যাইতে পারে। তরিতরকারির মধ্যে যদিও একমাত্র গোলআলুর নাম দেওয়া

বিভিন্ন বয়সের স্কুলের ছেলেমেয়েদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ

খাদ্যদ্রব্য	৪-৫ বৎসর	৬-৭ বৎসর	৮-৯ বৎসর	১০-১১ বৎসর	১২ বৎসর	১৩-১৪ বৎসর	১৫-২৬ বৎসর
দুধ	১২ ছটাক	১০ ছটাক	৮ ছটাক	৮ ছটাক	৮ ছটাক	৮ ছটাক	৮ ছটাক
মাছ	৩/৪ ,,	৩/৪ ,,	১ ,,	১ ,,	১ ,,	১ ,,	১ ,,
ডিম	—	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি
ডাল	১/৪ ,,	৩/৪ ছটাক	১ ১/৪ ছটাক	১ ১/৪ ছটাক	১ ১/৪ ছটাক	১ ১/৪ ছটাক	১ ১/২ ছটাক
গোলআলু	১ ১/২ ,,	১ ১/২ ,,	২ ১/২ ,,	২ ১/২ ,,	২ ১/২ ,,	২ ১/২ ,,	৩ ছটাক
শাক	১ ,,	১ ,,	১ ,,	১ ,,	১ ,,	২ ,,	২ ,,
কমলালেবু	১/২টি	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি
চাল	৩/৪ ছটাক	১ ছটাক	১ ছটাক	১ ১/২ ছটাক	১ ৩/৪ ছটাক	১ ৩/৪ ছটাক	৩ ছটাক
আটা	১/২ ,,	১/২ ,,	৩/৪ ,,	১ ,,	২ ,,	২ ,,	৩ ১/২ ,,
গুড় বা চিনি			১/২ ,,	১/২ ,,	১/২ ,,	১/২ ,,	১/২ ,,
মাখন	১/৪ ,,	১/২ ,,	১/২ ,,	১/২ ,,	১/২ ,,	১/২ ,,	১/৪ ,,
তেল	—	—	—	—	—	১/২ ,,	১/২ ,,
মোট ক্যালোরি:	১০৮০	১২৯১·৭	১৫০৮·৯	১৭২২·৭	১৯৪০·৭	২১৬০·৪	২৬১৪·২

বয়স্ক লোকদের সাধারণ রকমের পরিশ্রমে দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ*

খাদ্যদ্রব্য	আমিষ		নিরামিষ	
দুধ	৪ ছটাক	—	৪ ছটাক	—
ছানা	,,	—	১ ,,	—
মাছ	১ ,,	২ ছটাক	—	—
ডিম	১টি	—	—	—
ডাল	১ ছটাক	১ ছটাক	১ ছটাক	২ ছটাক
গোলআলু	৩ ,,	৩ ,,	কাঁঠাল বীজ	,,
			এঁচড়	,,
শাক	২ ,,	২ ,,	২ ,,	২ ,,
অঙ্কুরিত ছোলা	—	,,	—	,,
			পাতিলেবু	,,
			নারিকেল শাঁস	,,
চাল	৩ ছটাক	৩ ,,	৩ ,,	৩ ,,
আটা	৩ ,,	৩ ,,	৩ ,,	৩ ,,
গুড় বা চিনি	,,	,,	,,	গুড় ,,
মাখন	,,	,,	,,	,,
তেল	,,	,,	,,	,,
মোট ক্যালোরি	২৬০৪	২৬০৭·৬	২৬১১	২৬০৮·৭

* তালিকার দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভে অপেক্ষাকৃত সুলভ খাদ্যদ্রব্য ধরা হইয়াছে। তালিকাগুলি ১৯৩৯ সালের ১৫ই এপ্রিলের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট অবলম্বনে লিখিত।

কোনও ভাবে নারিকেল খাওয়া বিধেয়। বর্তমানে চিড়ামুড়ি ছাতু, ছোলা ভাজা, বাদাম প্রভৃতি যেরূপ অগ্নিমূল্য, তাহাতে জল খাবারের কথা উল্লেখ করিতেই সঙ্কোচ বোধ হয়; তথাপি যাঁহারা দোকানের নিমকি, শিঙাড়া বা জিলিপি কিনিয়া ছেলেদের দেন, তাঁহাদের জন্য কয়েকটি কথা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। চিড়া গুড় কলা; চিড়াগুড় নারিকেল কোরা; চিড়া দই কলা; আটার রুটি ও গুড়; মুড়ি নারিকেল কোরা; মুড়ি-শশা বা মূড়ি-মূলা; ছোলা-বাদাম ভাজা; ছাতু গুড় বা ছাতু দই গুড়; আমকালে আম চিড়া; আম ছাতু প্রভৃতি বাঙালীর জলখাবার বিস্কুট-কেকের বা দোকানের ভাজা খাবারের চেয়ে যে বহুগুণে উৎকৃষ্ট—সে কথা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন এবং সেকথা মনে রাখিয়া চলা আমাদের নিতান্তই কর্তব্য। সাদা চিনির চেয়ে গুড় উপকারী; কারণ শর্করা ব্যতীত গুড়ে লবণ পদার্থ ও ভিটামিন বি থাকে। সামর্থ্যে কুলাইলে ডিমসিদ্ধ ও ১টি গোলআলু সিদ্ধ, ১টি পাকা টম্যাটো বা কলা সহযোগে খাইলে উৎকৃষ্ট জলখাবার হয়।

আজকাল শহরবাসী অনেকেরই জলখাবারের সঙ্গে চা পান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'চা-পান না বিষপান' কথাটি অনেকেই শুনিয়াছেন। ফলতঃ শুধু পেটে পুনঃপুনঃ চা-পান শরীরের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর; পরন্তু, রুটি মাখন ডিম বা অন্য জলখাবারের সহিত দিনে দুই এক পেয়ালা চা খাওয়া দূষণীয় নয়। চায়ে শতকরা ৩।৪ ভাগ ক্যাফিন নামক সাদা, তিক্তস্বাদ, দানাদার পদার্থ

বিদ্যমান এবং উহাই চায়ের সক্রিয় উপাদান। স্নায়ুকেন্দ্রের উপর ক্রিয়াবশতঃ ক্যাফিন অবসাদ বা ঘুমের ভাব দূর করিয়া থাকে। এই কারণে প্রাতে এক পেয়ালা চা খাওয়ার পরে অনেকেরই কাজে, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক চালনার কাজে সুবিধা হয় বলিয়া জানা যায়। অবশ্য অত্যধিক মাত্রায় খাইলে উহা চিন্তাধারার বিশৃঙ্খলতা জন্মায়; কানের মধ্যেও ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতে থাকে। চায়ের মুখরোচকভাব উহার ট্যানিন নামক উপাদানের উপর নির্ভর করে। চায়ের জলের রং এই ট্যানিনের জন্য। চায়ের শতকরা ১০—১৭ ভাগ ট্যানিন থাকে। অধিকমাত্রায় ট্যানিন উদরস্থ হইলে উহা পরিপাক যন্ত্রের উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায়। অত্যধিক চা-পানে ক্ষুধামান্দ্যও দেখা যায়। সুতরাং চা-পানে বিশেষ সতর্কতা ও সংযম অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। ছেলেমেয়েদের চা-পানের অভ্যাস না করাই কর্তব্য।

সুস্থ শরীরে ফল খাইবার মত সামর্থ্য শহরবাসী অল্প লোকেরই আছে; সুতরাং খাবার সময় অন্ততঃপক্ষে পাতি-লেবু খাওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তাঁহারা বার মাসই কলা নারিকেল ছাড়া যে ঋতুতে যে ফল সহজ-প্রাপ্য,—টম্যাটো, কমলালেবু, শাঁখআলু, আম, লিচু, আনারস, জাম, জামরুল, বেল, পেয়ারা, কুল, আতা, বাতাবিলেবু কয়েৎবেল, কামরাঙা, আমলকী প্রভৃতি ছেলেদের খাইতে দিবেন। পাকা কাঁঠালের এবং তরমুজ-ফুটির কথাও ভুলিলে চলিবে না। ছোট ছেলেমেয়েদের পেয়ারা প্রভৃতি টক ফল খাইবার প্রতি

হইয়াছে, তথাপি কার্যক্ষেত্রে প্রত্যহ গোলআলু খাওয়া সম্ভব নয় বা সকল ঋতুতে উহা সংগ্রহ করাও দুষ্কর। সুতরাং উহার স্থানে বীট, গাজর রাঙাআলু, কাঁচ কলা, কাঁচা পেঁপে, মানকচু, ওল, মুখীকচু, ফুল, বাঁধা বা ওলকপি, পটল, বেগুন সোলাকচু, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি সহজলভ্য সামগ্রী খাইলেই চলিবে। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় গোলআলু, রাঙাআলু, মানকচু বা কাঁচকলার পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে চাল বা আটার পরিমাণ স্বতই কম লাগিবে। ফলতঃ ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশের লোকেরা পর্যাপ্ত সিদ্ধ বা ভাজা গোলআলু খাওয়ার দরুন তাদের রুটির খরচা খুবই কম পড়ে—অবশ্য ও সব দেশে গোলআলু খুব সস্তায় যথেষ্ট পাওয়াও যায়। আমাদের দেশে এই সব আলুর চাষ বাড়াইয়া সস্তায় সরাবরাহ করিলে এবং লোকেরা একটু অভ্যাস করিলে চাল আটার পরিমাণ কম হইলেও চালাইতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাতে দেশও খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। শিম, ঝিঙে, উচ্ছে, চিচিঙ্গে, সজিনার ডাঁটা, নটেডাঁটা কাঁঠালবীচি, ডুমুর, থোড়, মোচা, এঁচড় প্রভৃতিও বাদ দিলে চলিবে না। ঘণ্ট তরকারি প্রভৃতির মধ্যে চীনাবাদামের দানা দিলে উহার পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ বাদামে স্নেহ ও আমিষ জাতীয় পদার্থ প্রচুর থাকে। বাদামের তেল বাহির করিবার পর সেই শক্ত পদার্থ গুঁড়া করিয়া আটার সঙ্গে মিশ্রিত করিবার যে-কথা উঠিয়াছে তাহার চেয়ে প্রত্যহ তরি-তরকারিতে বাদাম দেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। নিরামিষ

তরকারিতে ঋতুবিশেষে আখের কুচি দিলে উহাতে তরকারির পুষ্টিকারিতা বাড়িতে পারে। কাটোয়ার ডাঁটার মত উহা চিবাইয়া খাইলে অনেক প্রকার উপকারী ভিটামিন এবং খানিকটা শর্করাও পাওয়া যায়। কলমি, শুষনি, হিঞ্চে, লালশাক, পালং, মটর বা ছোলার শাক, মূলোশাক, পেঁয়াজ পাতা ও কলি, শাফলা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির শাকও যে-ঋতুতে যাহা সহজ প্রাপ্য তাহাই গ্রহণীয়। আজকাল খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য কোনও কোনও খাদ্যবিদ্ ঘাস পাতার আমিষ পদার্থ মূল্যবান্ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু আমরা বিবিধ মুখরোচক শাক খাইয়াই থাকি। শাকের পরিমাণ সম্ভব মত বাড়াইলেই ত চলে। যাঁর সুবিধা আছে তিনি নিজে বহুবিধ শাক জন্মাইতেও পারেন। শাকের গুণাগুণ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কচুর ডাঁটার ঘণ্ট ইলিশ মাছের মাথা, নারিকেল কোরা বা চিংড়ি মাছ সহযোগে অতি উপাদেয় বস্তু। দুধ-ছানা প্রভৃতির সংস্থান যখন প্রায় অসম্ভব, তখন ডালের বড়াবড়ি, ধোকা প্রভৃতি মুখরোচক পদ বেশী ব্যবহার করা বিধেয়। অঙ্কুরিত বরবটি, ছোলা, মুগ, চীনাবাদাম ভাজা প্রভৃতিও প্রায়শঃ, বিশেষতঃ যে সব ছেলেরা খেলাধূলা করে তাহাদের বেশী খাওয়া কর্তব্য। তালিকায় মাখনের উল্লেখ থাকিলেও তাহার স্থলে সরিষা, তিল, বাদাম প্রভৃতির তেল ব্যবহার করিলেই চলিবে। হাইড্রোজিনেটেড তেলের ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্নেহ পদার্থের জন্য নারিকেল উপকারী সামগ্রী। সামর্থ্যে কুলাইলে প্রত্যহ যে

স্বভাবতই ঝোঁক দেখা যায়। সস্তা ফলের মধ্যে পেয়ারাতে ভিটামিন সি সবচেয়ে বেশী। একটি বড় পেয়ারাতে একশত হইতে তিনশত মিলিগ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আমলকীতেও ভিটামিন সি খুব বেশী। আখের রসে বিবিধ বি-ভিটামিন, ভিটামিন সি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে ; সুতরাং ছেলেমেয়েদের উহা প্রায়শঃ খাইতে দেওয়া উচিত। খাদ্যে ভিটামিন সির অভাব অকাল বার্ধক্যের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া জানা যায়।

বড় মাছ কিনিবার সামর্থ্য না থাকিলে কুচোচিংড়ি, পুঁটি, টেংরা, খলসে প্রভৃতি মাছ খাওয়াও ভাল। সামর্থ্যে কুলাইলে মাছের মাথা ও মাছের তেল বাড়িতে আনা উচিত। ইহাতে উচ্চস্তরের প্রোটিন ও ফসফেট প্রভৃতি উপকারী লবণ পদার্থ বাদে মাছের তেলের ভিটামিন এ ও ডি পাওয়া যায়। ভিটামিন বি$_২$ ও এ তে চোখ ভাল রাখে। ছোট মাছগুলিতেও বেশ ভিটামিন এ পাওয়া যায়। সুতরাং দুধ, মাখন, ডিম, ফল প্রভৃতি যাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে তাঁহাদের ভিটামিন এ, সি, বি প্রভৃতির জন্য শাকসব্‌জি ও ছোট মাছের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। দুধ মাছের সম্যক সংস্থান না হইলে শিশুদের কয়েক ফোঁটা করিয়া কডলিভার তেল এবং টম্যাটো বা কমলালেবুর রস বা অভাবে ডাবের জল খাওয়ানো বিধেয়। চিড়ার ক্বাথ, লেবুর রসও চিনি সহযোগে খাওয়ানও ভাল। এগুলিতে ভিটামিনের চাহিদা বেশ পূরণ হয়। ভিটামিন বি$_১$ প্রসঙ্গে একটি নূতন খবর এই যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদিগকে দৈনিক ২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি$_১$

খাইতে দেওয়ায় তাহাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাইতে এবং তাহাদিগকে অধিকতর চটপটে ও কর্মঠ হইতে দেখা গিয়াছে। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় এই তথ্য প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের কোন্‌গুলিতে ভিটামিন বি$_1$ বেশী পাওয়া যায়, তালিকা দেখিয়া সেইরূপ খাদ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

খাদ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিলে বাংলার উচ্চাভিলাষী ছেলেমেয়েদের মন সংস্কার-মুক্ত হইবে। তখন অবস্থা বিপর্যয়ে ভাতের বদলে রুটি বা গোল আলু দেখিলে তাহাদের মনে বিতৃষ্ণা আসিবে না। এখন বিলাতে গিয়া ভাত না পাওয়ায় অনেক ছেলেমেয়ে অনুযোগ করে এবং একারণ অনেকের শরীর ভাঙিয়া যায়। ইহাতে যে শুধু তাহাদেরই ক্ষতি হয় তাহা নয় পরন্তু উহাতে দেশেরও অকল্যাণ হয়। "আমাদের খাদ্য" পাঠে ছেলেমেয়েরা খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে সচেতন হইলে খাদ্য পদ্ধতির পরিবর্তন তাহারা অম্লান চিত্তে মানিয়া লইবে বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্থান কাল পাত্র ভেদে খাদ্যের পরিবর্তন স্বীকৃত হইলেও সহসা নূতন কোনও খাদ্যের প্রচলন সমীচীন নহে। যে সয়াবিন সম্বন্ধে এত হৈ চৈ হইতেছে, সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়া হইতে প্রকাশিত একখানি পত্রিকায় দেখিলাম, উহার বেশী ব্যবহারে গলগণ্ড রোগ জন্মিবার এবং থাইরয়েড গণ্ডের আয়োডিনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় বুদ্ধি হ্রাসেরও সম্ভাবনা আছে। অভাবে

স্বভাব নষ্ট হয়, এখন দেখিতেছি অভাবে পড়িয়া অজানা জিনিস খাইলে বুদ্ধিনাশও হইতে পারে।

আধুনিক পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা খাদ্যের পরিমাণের অপেক্ষা উহার উৎকর্ষের প্রতিই আমাদিগকে অধিকতর মনোযোগী হইবার নির্দেশ দিতেছে। খাদ্যের উৎকর্ষ কিসের উপর নির্ভর করে অন্যান্য অধ্যায়ে তাহা আলোচিত হইয়াছে। খাদ্যের উপকরণগুলি যত স্বভাবজাত ও যত বিভিন্ন প্রকারের হয়, ততই ভাল। এই কারণেই নানা প্রকারের শাকসবজি ও ফলমূলের উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন দেখা যাইতেছে যে, ভিটামিন ব্যতীত আণুবীক্ষণিক পরিমাণে অনেক প্রকার ধাতব পদার্থও অসাধারণ উপকারী—তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, অতি সামান্য পরিমাণ দস্তাও শরীরের পক্ষে অপরিহার্য। এইরূপ আরও অনেক পদার্থ হয়ত এখনও অনাবিষ্কৃত আছে। এই কারণে স্বভাবজাত নানাবিধ খাদ্যোপকরণ গ্রহণীয়; যেহেতু, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন মাটি ও জলে উৎপন্ন শাকসবজী, ফলমূল, দুধ, মাছ প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লবণ পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে থাকা স্বাভাবিক। বন-রসুন গাছ খাইলে পল্লীগ্রামে গাভীর দুগ্ধে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় —কলিকাতার উপকণ্ঠে অনেকস্থলে গোদুগ্ধে কচুরীপানার গন্ধ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। দুগ্ধের মধ্যে গাভীর খাদ্যের অনেক পদার্থই যে আসিয়া থাকে, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। শাকসবজী ফলমূলেও সেইরূপ ভূমির অনেক প্রকার ধাতব পদার্থ

বিদ্যমান। সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রদেশের শাকসবজীতে আয়োডিন থাকে বলিয়া সে সব স্থানের লোকের বুদ্ধির প্রাখর্য লক্ষিত হয় এবং তাহাদের গলগণ্ড রোগ হয় না—ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্য ও টাটকা তৃণলতা খাইলে গোদুগ্ধের উৎকর্ষ যেরূপ বৃদ্ধি পায়, উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগে উৎপন্ন শাকসবজী ও ফলমূলের গুণও সেইরূপভাবে বাড়িয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে তাহাতে যাঁহাদের সুযোগ আছে, তাঁহারা নিজেদের তরিতরকারি যথাসম্ভব নিজেরাই জন্মাইতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে বাড়ির ছেলেমেয়েরা অবসর মত যোগ দিলে তাহাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময়ানুবর্তিতা, কার্যকারণ সম্বন্ধ, সারের ও জলসেচনের প্রত্যক্ষ উপযোগিতার বিষয়ে তাহারা সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। চারাগাছ উপযুক্ত সার ও জল পাইলে যেরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়া ওঠে, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যও সেইরূপ সক্রিয়। বিলাতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের টিফিনে দুধ ও ফলমূলের ব্যবস্থা হওয়ায় তাহাদের ওজন, উচ্চতা ও অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়। নিউক্যাসল শহরে দেখা গিয়াছে যে, অবস্থাপন্ন পরিবারের চেয়ে দরিদ্র পরিবারে হামে মৃত্যুর হার তিনগুণ এবং ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগের আক্রমণ ৮ গুণ বেশী। ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাবও অসচ্ছল পরিবারেই বেশী লক্ষিত হয়। সুতরাং খাদ্যের উৎকর্ষের সহিত ব্যাধি-প্রতিষেধক ক্ষমতার যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলাতের লোকেরা আমাদের

চেয়ে অনেক বেশী ধনী, তাহাদের আহার্যও অনেক উন্নত—এতৎসত্ত্বেও সম্প্রতি সার জন ওরের অনুসন্ধানে প্রকাশ, সে দেশেও শতকরা ৫০ জন লোকেরই ভিটামিনের, বিশেষতঃ বি-ভিটামিনের ঘাট্‌তি বিদ্যমান। আমাদের *দেশের শতকরা ৯০ জনেরও বেশী লোকের শুধু ভিটামিন নয়, পরন্তু খাদ্যের* অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদানেরও নিদারুণ অভাব। দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও শিল্পোন্নতির দ্বারা আর্থিক সচ্ছলতা না ঘটিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদিগকে শৈশব হইতেই খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করিয়া না তুলিলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিতান্তই নৈরাশ্যজনক।

বাংলার শহরবাসীর খাদ্য যে অতিশয় নিকৃষ্ট, তাহা তাহাদের দাঁত ও চোখের অবস্থা হইতেই প্রতীয়মান হয়। শয্যা গ্রহণের মত প্রত্যক্ষ পীড়া না থাকিলেও আমাদের মধ্যে ষোল আনা স্বাস্থ্যের অধিকারী যে একজনও প্রায় নাই, তাহা অতিশয়োক্তি নয়। কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও বলিতে চাই যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত বহু সমবায় সমিতি অগৌণে শাকসব্‌জী, মাছ মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি শহরের উপকণ্ঠে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করিয়া শহরবাসীদিগকে সুলভে সরবরাহ না করিলে, শহরের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঁচিবার আশা নাই।

আজকাল 'ব্যালান্স্‌ড্‌ ডায়েট' বা সুসমঞ্জস খাদ্য বলিয়া কথা খুব শোনা যায়। 'ব্যালান্স্‌' করা শব্দটির অর্থ ভারসাম্য রাখা। খাদ্যের সমতারক্ষা করার অর্থ কি দেখা যাউক। খাদ্যের

উপাদানগুলির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। খাদ্যকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শক্তিপ্রদ খাদ্য ও রক্ষী খাদ্য। তেল, ঘি, ভাত, রুটি, ছাতু, চিড়া, চিনি প্রভৃতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর খাদ্য এবং মাছ মাংস, ডিম, শাকসব্জী ও ফলমূল দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। দৈনিক আহার্যে যাহাতে উভয় প্রকারের খাদ্যের সঙ্গত সমাবেশ থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

পূর্বকালে বাঙালীর খাদ্য যে অতিশয় সুসমঞ্জস ছিল ভারতচন্দ্র, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙালী কবিদের কাব্যে বর্ণিত খাদ্য-সামগ্রী হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উঁহাদের কাব্যে নানাপ্রকারের শাক, তরিতরকারি, বাংলার নদীনালার বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের নানাবিধ মুখরোচক ব্যঞ্জনের এবং বাংলার পল্লী-অঞ্চলের সুমিষ্ট দুগ্ধের এতপ্রকার সুখাদ্যের উল্লেখ আছে যে, তাহা পড়িলে জিহ্বার জল সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণায় সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, প্রাচীনকালের বাঙালীর আহার্য যে সম্পূর্ণরূপে সেইরূপ, বরং তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই সেকালের বাঙালী সন্তানও ছিলেন ব্যাঘ্র-পদবাচ্য—শৌর্যবীর্যের জীবন্ত প্রতীক। ফাঁকি দিয়া মহৎ কাজ হয় না বলিয়া একটি কথা আছে। প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়া—অর্থাৎ সুসমঞ্জস খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, শরীর রক্ষা করাও সেইরূপ অসম্ভব। 'গোপাল যা পায় তাই খায়' শুনিতে অভ্যস্ত বাঙালীজাতিও নিরীহ গোপালের মত অভাব অনটনে পড়িয়া

পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্তঃসারশূন্য হইতে বসিয়াছে। আজ নব যুগের বাঙালী ছাত্রদের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে—তাঁহারা এ কথা যেন সতত স্মরণ রাখেন যে, জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য-গৌরব বলহীনের লভ্য নয়। যিনি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, স্বাস্থ্য না থাকিলে সাফল্যলাভ সুদূরপরাহত; আর স্বাস্থ্যের প্রধান উৎস যে খাদ্য, সে কথা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। জার্মান ভাষায় একটি কথা আছে—Der Mensch ist, was er isst. (দের মেন্‌শ ইসট্‌ ভাস্‌ এর ঈসট্‌)—মানুষ তাই, সে যাহা খায়; অর্থাৎ খাদ্যের উৎকর্ষের উপরেই মনুষ্যোচিত গুণাবলী—শৌর্যবীর্য, কর্মঠতা, আয়ু ও বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে। আশা করি, কোমলমতি বালক-বালিকাগণ ও খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন অভিভাবক ও শিক্ষক-বর্গ এই পুস্তকপাঠে খাদ্যনির্বাচনে সহায়তা লাভ করিবেন এবং আগামী দিনের তীব্রতর জীবনসংগ্রামে জয়লাভের সামর্থ্য সঞ্চয় করিয়া বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ গৌরবদৃপ্ত করিয়া তুলিবেন।

সর্বোপরি খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে সর্বদাই বীজমন্ত্রের মত সশ্রদ্ধ স্মরণ রাখিতে হইবে—

খাওয়ার জন্য বাঁচা নয় ভবে
বাঁচার জন্য খাওয়া—
বাঁচা মানে বৃথা কালক্ষেপ নয়,
কাজ ক'রে শুধু যাওয়া।

সমাপ্ত

"বর্তমান খাদ্য-সমস্যার দিনে খাদ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই সঙ্কোচ বোধ হয়। যেখানে অধিকাংশ লোকই অতি কষ্টে উদর-পূর্তি করিতেছে, সেখানে খাদ্যের ভালমন্দ ভাবিবার অবসর কোথায়! তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাচুর্যের সময় অপেক্ষা অনটনের মধ্যেই খাদ্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিক প্রয়োজন। সামান্য আয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য কিরূপে সংগ্রহ করা যায়, এই পুস্তকে লেখক তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। * * "